বাংলা নির্বাচিত কথাসাহিত্যে দিব্যাঙ্গ চরিত্র

গবেষণামূলক প্রকল্পের শিরোনাম

অনুগবেষক-অনুগবেষিকাগণ

বিউটি সামন্ত।
শম্পা মন্ডল।
সঙ্গীতা জানা।
সংকলিতা অধিকারী।
সৌমেন দিন্ডা।
সুতৃষ্ণা মন্ডল।

তত্ত্বাবধায়ক

ড. রাকেশ জানা
শ্রী অভি কোলে

বাংলা বিভাগ
মেদিনীপুর সিটি কলেজ
কুতুরিয়া, পোষ্ট- ভাদুতলা, পশ্চিম মেদিনীপুর,
পিন- ৭২১১২৯

২০২৩

স্ব-ঘোষণাপত্র

আমরা বিউটি সামন্ত, শম্পা মণ্ডল, সঙ্গীতা জানা, সৌমেন দিত্তি, সংকলিতা অধিকারী, সুতৃষ্ণা মণ্ডল বাংলা বিভাগের স্নাতকোত্তর দ্বিতীয় পাঠ পর্যায়ের BNG-205 পত্রের প্রকল্পের জন্য 'বাংলা নির্বাচিত কথাসাহিত্যে দিব্যাঙ্গ চরিত্র' শীর্ষক এই কার্যটি প্রস্তুত করেছি। এই প্রকল্পটি আমাদের যৌথ পরিশ্রমের ফল। এই কার্যটি অন্য কোন মহাবিদ্যালয়ে প্রকল্পপত্ররূপে জমা দেওয়া হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই।

তারিখ-

স্থান- মেদিনীপুর সিটি কলেজ
পশ্চিম মেদিনীপুর

.....

অনু গবেষিকা/গবেষক
বাংলা বিভাগ
মেদিনীপুর সিটি কলেজ

Approval sheet

This project report entitled "বাংলা নির্বাচিত কথাসাহিত্য দিব্যাঙ্গ চরিত্র" by বিউটি সামন্ত, শম্পা মণ্ডল, সঙ্গীতা জানা, সৌমেন দিন্ডি, সংকলিতা অধিকারী, সুতৃষ্ণা মণ্ডল are approved for the degree of বাংলা বিভাগ স্নাতকোত্তর দ্বিতীয় পাঠপর্যায়।

Signature of Examiners
Name:

Signature of Guide
Name: Dr. Rakesh Jana
Sri Abhi Koley

Signature of Principal
Name: Dr. Sudipta Chakraborti

Signature of Directors
Dr. Pradip Ghosh
Director
Midnapore City College

Date:

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

"বাংলা নির্বাচিত কথাসাহিত্য দিব্যাঙ্গ চরিত্র" এই শিরোনামে আমাদের প্রস্তাবিত প্রকল্পকার্যে দিব্যাঙ্গদের জীবনচিত্র এবং সাহিত্যে তাদের প্রভাব কতটা এই মূল্যায়ন কার্যে আমরা ব্রতী হয়েছি। আমাদের এই প্রচেষ্ঠার ক্ষেত্রে যিনি আমাদের পরিপূর্ণ ভাবে পরিকল্পনা ও সহযোগিতা দান করেছেন তিনি হলেন মেদিনীপুর সিটি কলেজের বাংলা বিভাগীয় প্রধান তথা আমাদের প্রকল্পকার্যের তত্ত্বাবধায়ক ড: রাকেশ জানা মহাশয়। প্রকল্পকার্যের উপযোগী বিভিন্ন তথ্যের পাশাপাশি নানা মূল্যবান উপদেশ দিয়ে তিনি আমাদের সমৃদ্ধ করে চলেছেন, এজন্য আমরা চিরকৃতজ্ঞ।

এছাড়াও যার সহযোগিতা ছাড়া আমাদের এই প্রকল্পটি অধরা থেকে যেত তিনি হলেন মেদিনীপুর সিটি কলেজের বাংলা বিভাগের সহ অধ্যক্ষ মাননীয় অভি কোলে মহাশয়। তিনি তার সুদক্ষ দৃষ্টি দিয়ে আমাদের কার্যের ভুল-ত্রুটিগুলি সংশোধনের মধ্য দিয়ে আমাদের সঠিক পথের দিকে এগিয়ে দিয়েছেন, এজন্য আমরা চিরকৃতজ্ঞ।

প্রকল্পকার্যের ব্যাপারে আমাদের সর্বদা উৎসাহিত এবং সর্বতোভাবে সহযোগিতা করে চলেছেন মেদিনীপুর সিটি কলেজের কর্নধার ড: প্রদীপ ঘোষ মহাশয় এবং ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ড: কুন্তল ঘোষ মহাশয়, তাদের কাছে আমরা আন্তরিক ভাবে কৃতজ্ঞ।

ধন্যবাদ জানাই মেদিনীপুর সিটি কলেজের গ্রন্থাগারিক কর্মীদের প্রকল্প কার্যের প্রয়োজনীয় নানা পত্র-পত্রিকা, পুস্তক দিয়ে তাঁরা নিরন্তর ভাবে আমাদের সাহায্য করে চলেছেন, এজন্য আমরা চিরকৃতজ্ঞ।

এছাড়াও আমাদের কার্যের মূল 'দিব্যাঙ্গ' শব্দটির ব্যবহার যেহেতু বহুল প্রচলিত নয়। তাই আমরা কার্যটি সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে কোথাও কোথাও 'প্রতিবন্ধী' শব্দটি ব্যবহার করেছি। আমাদের এই ভুল ত্রুটিগুলি ক্ষমাসুন্দর চোখে দেখার আবেদন জানাই।

বিনীত
বিউটি সামন্ত
সঙ্গীতা জানা
সৌমেন দিন্ডি
শম্পা মণ্ডল
সংকলিতা অধিকারী
সুতৃষ্ণা মণ্ডল

সারাংশ

বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে দিব্যাঙ্গ তথা স্বাভাবিক জীবনস্রোত থেকে বঞ্চিত মানুষরা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রূপে এসেছেন। কখনো কেবলমাত্র মানুষ হিসাবে, কখনোও আবার তাদের চাওয়া-পাওয়া বাণীরূপে পেয়েছে বিশেষ কোনো সম্পর্কের মধ্যে। আবার প্রতিবন্ধী মানুষের ক্ষেত্রে সমাজের দৃষ্টিভঙ্গিও দুই রকম। এক হলো সহানুভূতি বা করুণা আর এক হল হাসি-মজা অর্থাৎ ট্রাজেডি এবং কমেডি। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন- "হাসি আর কান্নার তফাৎ খুবই সূক্ষ্ম। মানুষ হাসতে হাসতে কাঁদে আবার কাঁদতে কাঁদতে হাসে"। বিভিন্ন সাহিত্যে এই দিব্যাঙ্গ চরিত্রগুলির নিদর্শন আমরা পেয়ে থাকি। সাহিত্যের পাতার এই চরিত্রগুলি এক নতুন দিগন্ত দ্বার উন্মোচন করে। সাহিত্যে এই দিব্যাঙ্গ মানুষদের ঐতিহাসিক-সামাজিক-অর্থনৈতিক-আইনী অনুশাসন প্রেক্ষিতে অবস্থান সূচিত করে। নির্বাচিত বাংলা কথাসাহিত্য অবলম্বনে দিব্যাঙ্গদের অবস্থান নির্ণয় করা হয়েছে প্রকল্পের অভিসন্দর্ভে। শুধুমাত্র বাংলা কথাসাহিত্যে নয়, বাংলা শিশু কিশোর সাহিত্যে, পৌরাণিক কাহিনীতেও এই দিব্যাঙ্গ মানুষদের কথা আমরা পেয়েছি। এছাড়াও সমাজের কিছু যুক্তিহীন নিয়ম থেকে কিভাবে এই দিব্যাঙ্গ মানুষেরা বেরিয়ে আসতে পেরেছে তা তুলে ধরেছি। এই দিব্যাঙ্গ মানুষদের জন্য যে সমস্ত আইনী ব্যবস্থা করা হয়েছে তা আলোচনা করেছি। প্রকল্পকার্যটি কয়েকটি অধ্যায়ে অগ্রসর হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়, প্রতিবন্ধকতার স্বরূপ ও প্রকৃতি। এই অধ্যায়ে আমার প্রতিবন্ধী কাদের বলা হয় তা আলোচনা করেছি। 'প্রতিবন্ধী' শব্দটিকে সমাজ পরিহার করে 'দিব্যাঙ্গ' শব্দের ওপর জোর দিয়েছে। এই অধ্যায়ে প্রতিবন্ধকতাকে বিভিন্ন প্রকারে ভাগ করে দেখানোর চেষ্টা করেছি। একটি শিশু বা একটি মানুষ যখন দিব্যাঙ্গ হয় তখন তাঁর নানা কারণ থাকে। সে কারণগুলি এই অধ্যায়ে দেখিয়েছি।

দ্বিতীয় অধ্যায়, পুরাণ মহাকাব্যে প্রতিবন্ধী চরিত্রের প্রয়োগ। এই অধ্যায়ে পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারতে যে সমস্ত দিব্যাঙ্গ চরিত্রগুলি রয়েছে তা তুলে ধরেছি। পুরাণ মহাকাব্যের এ বিশেষ দিব্যাঙ্গ চরিত্রগুলির তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থায় যে সামাজিক প্রেক্ষাপটের কথা উঠে এসেছে, তা প্রকল্পকার্যের এই অধ্যায়ে আলোচনা করেছি।

তৃতীয় অধ্যায়, বাংলা শিশু কিশোর সাহিত্যে প্রতিবন্ধী চরিত্র। এই অধ্যায়ে শিশু কিশোর সাহিত্য অর্থাৎ রূপকথা, উপকথা, রাজকন্যা-রাজপুত্রের গল্পে যেসব দিব্যাঙ্গ চরিত্র রয়েছে তা তুলে ধরেছি আবার কিছু কিছু বিখ্যাত শিশু সাহিত্যিকদের বেশকিছু উল্লেখযোগ্য গল্প আমরা এই অধ্যায়ে আলোচনা করেছি। যেমন দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের 'ঠাকুরমার ঝুলি', উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর 'টুনটুনির বই', 'ছোট্ট রামায়ণ', 'গল্পমালা' ইত্যাদি গল্পের দিব্যাঙ্গ চরিত্রগুলি পেয়েছি। এছাড়াও

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ক্ষীরের পুতুল' (১৮৯৬) গল্পে দুঃখী দুয়োরানী দাসীর চরিত্র, লীলা মজুমদারের 'নেপোর বই'(১৯৬৯), 'কাঠের ঘোড়া', 'পাখি', 'তানের ডাইরি' প্রভৃতি গল্পের দিব্যাঙ্গ চরিত্রগুলি কিভাবে দিব্যাঙ্গতা কাটিয়ে জীবনের মূল স্রোতে ফিরে এসেছে তা এই অধ্যায়ে আলোচনা করেছি।

চতুর্থ অধ্যায়, নির্বাচিত বাংলা কথাসাহিত্যে চরিত্রকেন্দ্রিক প্রতিবন্ধী চরিত্র. এই অধ্যায়ে বিখ্যাত কথা সাহিত্যিকদের বেশ কিছু উপন্যাস ও গল্প তুলে ধরেছি। যেখানে দিব্যাঙ্গ চরিত্রগুলি বর্তমান। যেমন- মোহাম্মদ লুৎফর রহমানের 'সরলা'(১৯১৮), মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি'(১৯৩৬), বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'রাধারানী'(১৮৭৫), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'মালঞ্চ'(১৩৪০বঙ্গাব্দ), মনি মুখোপাধ্যায়ের 'গণতন্ত্র ও গোপাল কাহার'(১৯৭১-১৯৭৯), বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'রজনী'(১৮৭৫) প্রভৃতি উপন্যাসের যে সব দিব্যাঙ্গ চরিত্র রয়েছে তা তুলে ধরেছি। এছাড়াও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সরীসৃপ'(১৯৩৯), 'কুষ্ঠরোগীর বউ'(১৯৪১-১৯৪৩), 'প্রাগৈতিহাসিক'(১৯৩৭), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সুভা'(১২৯৯বঙ্গাব্দ), মনীষ ঘটকের 'পটলডাঙ্গার পাঁচালী'(১৯৫৬) আলোচনা করেছি এই অধ্যায়।

পঞ্চম অধ্যায়, সমাজের প্রতিবন্ধকতাঃ প্রতিবন্ধী সমাজ। এই অধ্যায়ে প্রতিবন্ধী মানুষেরা সমাজে কিভাবে লড়াই করে বেঁচে আছে তা তুলে ধরেছি। সমাজ এই প্রতিবন্ধী মানুষদের স্বাভাবিক ভাবে মেনে নিতে পারেনা। সমাজের আর পাঁচটা সুস্থ মানুষের মতো এই প্রতিবন্ধীদেরও সমাজে এগিয়ে যেতে হবে। প্রতিবন্ধীদের নিয়ে প্রচলিত কুসংস্কার ও ভুল ধারণা কাটিয়ে ওঠে এইসব মানুষেরা আবার স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসেছে। যার আলোচনা আমরা এই অধ্যায়ে করেছি।

ষষ্ঠ অধ্যায়, আইন অনুশাসনে প্রতিবন্ধী চরিত্র। এই অধ্যায়ে দিব্যাঙ্গদের অধিকারের কথা বলা হয়েছে। ভারতীয় সংবিধানে এর প্রতিবন্ধী মানুষদের যেসব আইন রয়েছে তা তুলে ধরেছি। এছাড়াও প্রতিবন্ধী মানুষদের সমাজে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য আইন যেসব ব্যবস্থা করেছে তা এই অধ্যায়ে আলোচনা করেছি।

উপসংহারে দিব্যাঙ্গ চরিত্রের সমাজের মূলস্রোতে প্রতিষ্ঠার কথা তুলে ধরেছি। দিব্যাঙ্গ চরিত্রগুলি বাংলা কথাসাহিত্যে, শিশু কিশোর সাহিত্যে, এমনকি পৌরাণিক কাহিনীগুলিতে কিরূপ প্রতিফলিত হয়েছে তা আলোচনা করেছি। এছাড়াও ভবিষ্যতে এই বিষয়ে কাজ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছি।

সূচীপত্র

নং	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা নং
১.	ভূমিকা	০১-০২
২.	প্রকল্পকার্যের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য	০৩-০৮
৩.	প্রকল্পকার্যের পদ্ধতি	০৯
৪.	অধ্যায় বিভাজন	
	ক. প্রথম অধ্যায় -	১০-১৮
	খ. দ্বিতীয় অধ্যায় -	১৯-২৪
	গ. তৃতীয় অধ্যায় -	২৫-২৮
	ঘ. চতুর্থ অধ্যায় -	২৯-৫২
	ঙ. পঞ্চম অধ্যায় -	৫৩-৫৭
	চ. ষষ্ঠ অধ্যায় -	৫৮-৬১
৫.	উপসংহার	৬২
৬.	গ্রন্থপঞ্জি	৬৩-৬৪
৭.	তথ্যসূত্র	৬৫

ভূমিকা

মেদিনীপুর সিটি কলেজের বাংলা বিভাগের অধীনে আমরা যে প্রকল্প কার্যে মনোনিবেশ করেছি সেই প্রকল্পের বিষয় শিরোনাম 'বাংলা নির্বাচিত কথা সাহিত্যে দিব্যাঙ্গ চরিত্র'। এবার আমরা আলোচনা করব 'দিব্যাঙ্গ' বলতে কি বোঝানো হয়েছে? আসলে যে সকল মানুষেরা চলার পথে প্রতিমুহূর্তে বাধাপ্রাপ্ত হয় তাদের আমরা দিব্যাঙ্গ বলে থাকি। কথাসাহিত্যের বিপুল আঙিনায় এই চরিত্র সংখ্যা খুব বেশি নয়, যদিও বা আছে তা অল্পবিস্তর, তবুও খুব কমই এরা প্রধান চরিত্র। সাধারণত পার্শ্বচরিত্র হিসাবেই রয়েছে এই চরিত্রগুলি। কিছু কিছু ক্ষেত্রে অবশ্য এরা প্রধান চরিত্র হয়ে উঠেছে, বাংলা কথাসাহিত্যে আলোচনা প্রসঙ্গে সাথে সাথে পুরাণ ও মহাকাব্য থেকেও বেশ কিছু চরিত্র তুলে আলোচনার চেষ্টা করেছি।

দিব্যাঙ্গতা নিয়ে চর্চা পাশ্চাত্যে অনেক দিন ধরে চলে আসলেও বিষয়টি বাংলায় একেবারেই বহুল প্রচলিত নয়, প্রথমদিকের ব্যক্তি মানুষের শারীরিক ও মানসিক দিব্যাঙ্গতা ধীরে ধীরে সামাজিক স্তরে পরিণত হয়েছিল। দিব্যাঙ্গতা সংক্রান্ত প্রাথমিক পর্যায়ে তাই Impaiment (প্রতিবন্ধকতা) এবং Disability (অক্ষমতা) শব্দ দুটির বিভেদ সুস্পষ্ট করার বিষয়ে জোর দেওয়া হয়, Impaiment বলতে মূলত দৈহিক গঠন আকৃতি এবং অঙ্গসংস্থানগত কোনো অস্বাভাবিকতাকে বোঝায়, প্রধানত অঙ্গসংস্থান বা পেশিগত প্রতিবন্ধকতাকে বোঝাতে Impaiment কথাটি ব্যবহার করা হয়।। যেমন, কোনো ব্যক্তির হয়তো ডান হাতের দুটি আঙুল নেই, এই আঙুল দুটোর অভাব তাঁর কোনো বিশেষ কাজের ক্ষেত্রে হয়তো সামান্য অসুবিধার সৃষ্টি করতে পারে, কিন্তু এই অসুবিধা তাঁর সামগ্রিক অগ্রগতিতে বিশেষ বাধা সৃষ্টি করতে পারেনা। এক্ষেত্রে ওই ব্যক্তিকে Impaired বলা হয়।

আবার Disability হলো শারীরিক গঠন, অঙ্গসংস্থানগত এবং পেশিগত কোনো অসুবিধা যদি কোনো ব্যক্তির দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন কাজকর্মের ক্ষেত্রে বিশেষ অসুবিধার সৃষ্টি করে তখন ওই ব্যক্তি Disability বা অক্ষমতার অন্তভুক্ত হয়। এই Impaiment এবং Disability থেকে দুটি মডেল উঠে আসে। প্রথমত, শারীরিক দিব্যাঙ্গতা: এক্ষেত্রে ব্যক্তির নিজস্ব অক্ষমতার ক্ষেত্রটি নিজের ক্ষেত্র পরিসরেই সীমাবদ্ধ থাকে। দ্বিতীয়ত, সামাজিক দিব্যাঙ্গতা: এক্ষেত্রে ব্যক্তি অক্ষমতা বৃহত্তর ভাবে সমাজের উপর প্রভাব বিস্তার করে।

দিব্যাঙ্গতা সংক্রান্ত আলোচনার সূত্রপাত হয়েছিল ১৯৬০ এর সময়ে আমেরিকায়। এই আলোচনার পরিধি স্থান-কাল-পাত্রের সীমানা ছাড়িয়ে বৃহত্তর রূপে প্রকাশ পেয়েছে। অক্ষমতা যুক্ত

মানুষদের সামাজিক কুসংস্কারের গন্ডী থেকে মুক্ত করে বৃহত্তর আঙিনায় আনার বিষয়টিকে জোর দেওয়া হয়েছে এই আলোচনায়।

আমাদের সমাজেও দিব্যাঙ্গদের অভিশাপ রূপে দেখা হয়েছে। প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাসে। এই দিব্যাঙ্গদের নিয়ে রয়েছে নানা কলঙ্কিত অধ্যায়, প্রাচীনকালে রোমবংশে দৃষ্টিহীন শিশুদের মাটির পাত্রে শুইয়ে ভাসিয়ে দেওয়া হত টাইবার নদীতে, আবার এথেন্সে বিকলাঙ্গদের খাবার না দিয়ে মেরে ফেলে হত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় হিটলারের T-4 আইনের সাহায্যে বিকলাঙ্গদের নির্বিচারে মেরে ফেলা হয়েছে। এই সময় হাজার হাজার দিব্যাঙ্গরা মারা গেছে হয় গুলি খেয়ে না হয় বাধ্য হয়ে গ্যাস চেম্বারে ঢুকে। আমাদের ভারতবর্ষেও অতীতে এইরকম হত্যার কথা জানা যায়।

আমাদের প্রকল্পকার্যে দিব্যাঙ্গতার ক্ষেত্রে দৈহিক এবং সামাজিক দুটি মডেলেই গৃহীত হয়েছে। ব্যক্তি তো সমাজেরই অঙ্গ, আর ব্যক্তিকে গঠন করে সমাজ। তাই সমাজ এবং ব্যক্তিকে পৃথকসত্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা যায় না। এরা একে অপরের পরিপূরক। রাষ্ট্রে বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন আইনের অনুশাসনে প্রতিবন্ধীদের অধিকার সুরক্ষিত হয়েছে। সমাজে একজন প্রতিবন্ধী মানুষের অবস্থান এবং সেই অবস্থান পরিবর্তন করার ক্ষেত্রে সমাজের ভূমিকা কেমন তার প্রতিফলন বাংলা কথাসাহিত্যে কতটা পরিস্ফুটিত তা দেখার চেষ্টা করব এই কার্যের মধ্য দিয়ে।

‘কথাসাহিত্য’ একটি শিল্প মাধ্যম, যা ক্ষনকালের জীবনকেও পরিনত করে নিত্যকালের জীবনে। আধুনিক কালে ‘কথাসাহিত্য’ বলতে আমরা উপন্যাস ও ছোট গল্পকেই বুঝি। সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের কথাসাহিত্যের প্রভাব সুদূর প্রসারী। ‘কথাসাহিত্যে’ দিব্যাঙ্গদের বাস্তব চিত্রটি তুলে ধরা হয়। সামাজিক অন্যায় অবিচার, শোষন, বঞ্চনার মধ্য দিয়ে চরিত্রগুলি কিভাবে নিজের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রেখেছে, তা কথা সাহিত্যিকরা তাদের লেখায় তুলে ধরেছেন। তাঁরা তাদের বেশির ভাগ লেখায় দিব্যাঙ্গদের নিয়ে সমাজকে কোনো না কোনো বার্তা দিয়ে থাকেন।

তাই আমরা বিভিন্ন কথাসাহিত্যকদের রচিত গল্প, ছোট গল্প, উপন্যাসগুলি আলোচনা ও পর্যালোচনার মধ্য দিয়ে দিব্যাঙ্গ চরিত্রগুলির অবস্থান ও তাদের কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা সমস্যা গুলির সমাধানের প্রয়াস করব এবং তা করতে গিয়ে আমাদের প্রকল্পের বিষয়কে অধ্যায়ে বিভাজন করে আলোচনা করব।

প্রকল্পকার্যের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

কোনো একটি বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে এবং সুপরিকল্পিত পরীক্ষার বা মূল্যায়নের মাধ্যমে যে কার্যসম্পাদন করা হয় তাকে আমরা প্রকল্প বলে থাকি। আমাদের প্রকল্পের শিরোনাম 'বাংলা নির্বাচিত কথা সাহিত্যে দিব্যাঙ্গ চরিত্র'। এই কার্যটি আমরা বেছে নিয়েছি বাংলা সাহিত্যে দিব্যাঙ্গ চরিত্রগুলির অবস্থান নির্ণয়ের পাশাপাশি তাদের সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট ধারণা গড়ে তোলার জন্য। প্রত্যেক ঘটনার পিছনে কোনো না কোনো লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য থাকে। লক্ষ্যহীন ভাবে কোনো কার্যসম্পন্ন করা যায় না। তাই আমাদের এই কার্যের ক্ষেত্রে যে বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যগুলি রয়েছে সেগুলির সংক্ষিপ্ত আলোচনা আমরা এখানে করেছি।

(ক) প্রথমেই দিব্যাঙ্গ বলতে কী বোঝায় সে বিষয়ে বিস্তারিত পর্যালোচনা করা।

'দিব্যাঙ্গ' শব্দটির অর্থ সুন্দর, শুদ্ধ ও পবিত্র দেহ। আমাদের দেশে প্রতিবন্ধকতা বোঝাতে 'বিকলাঙ্গ' শব্দটি ব্যবহৃত হত। ২০১৬ সালের ২২ শে জানুয়ারি বারাণসীর এক সামাজিক আধিকারিতা শিবিরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী 'দিব্যাঙ্গ' শব্দটি ব্যবহারের উপর জোর দিয়েছেন। তিনি বলেন, এই ধরনের মানুষদের অক্ষমতা কোনোও ভাবেই তুলে ধরা উচিত নয়, বরং অন্যান্য ক্ষেত্রে তাঁদের যে অসাধারণ ক্ষমতা রয়েছে সেগুলিই উল্লেখ করা প্রয়োজন।

যেসব ব্যক্তি দৈহিক, ইন্দ্রিয়গত, মানসিক ও শিখনগত ত্রুটির কারণে নির্দিষ্ট মাত্রায় স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় অক্ষম তাদের দিব্যাঙ্গ বলে। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO) এর মতে, **"একজন প্রতিবন্ধী হচ্ছেন তিনি, যার স্বীকৃত শারীরিক ও মানসিক ক্ষতিগ্রস্ততার দরুন যথোপযুক্ত কর্মসংস্থানের প্রত্যাশা কমে যায়"।**

UNDP (United Nations Development Programm) এর মতে, বর্তমান বিশ্বের মোট জনসংখ্যার প্রায় ১৫% কোনো না কোনো ভাবে প্রতিবন্ধকতা শিকার। ২০১৩ সালের বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) এর জরিপে পৃথিবীর মোট জনসংখ্যা ১০ ভাগ প্রতিবন্ধী।

প্রতিবছর ৩ ডিসেম্বরকে বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস হিসেবে পালন করা হয়। ১৯৯২ সাল থেকে এই দিবসটি পালিত হয়ে আসছে জাতিসংঘে তত্ত্বাবধানে।

সারা বিশ্বে বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধী আছে। শারীরিক প্রতিবন্ধী সহ বাক, দৃষ্টি, শ্রবন এবং বুদ্ধি প্রতিবন্ধী। কিন্তু এই প্রতিবন্ধত্বের হার এবং সংখ্যা ধনী দেশের তুলনায় গরীব দেশে অনেক বেশি। কুসংস্কার, পুষ্টিহীনতা, গর্ভবতী মায়েদের স্বাস্থ্যসেবার দৈন্য অবস্থা, নানারকম রোগ-ব্যাধি এবং সড়ক দুর্ঘটনার কারণে আমাদের দেশে প্রতিবছর লাখ লাখ মানুষ বিভিন্ন রকম প্রতিবন্ধকতার শিকার হয়।

এই সকল প্রতিবন্ধীদের প্রতি একটা স্বচ্ছ ধারণা গড়ে তোলা আমাদের প্রকল্পের একটি লক্ষ্য।

(খ) পৌরাণিক কাহিনী বা পুরানে দিব্যাঙ্গ চরিত্রগুলির উল্লেখ করে এদের সামাজিক অবস্থান কিরূপ তা পর্যালোচনা করা।

পুরাণ মহাকাব্যে বিশেষ কিছু দিব্যাঙ্গ চরিত্র রয়েছে। শুধু আমাদের দেশ নয়, দেশ-বিদেশের পুরাণ মহাকাব্যগুলিতে দিব্যাঙ্গ চরিত্ররা কেমন তা তুলে ধরাও আমাদের প্রকল্পের একটি উদ্দেশ্য। তৎকালীন সমাজব্যবস্থা এবং এই বিশেষ মানুষগুলির অবস্থা কেমন ছিল তা তুলে ধরার চেষ্টা আমরা করেছি। এরূপ দিব্যাঙ্গ চরিত্র হল-

পুরাণের- কুবের, গনেশ, জগন্নাথ, জড়ভরত।

রামায়নের - অন্ধকমুনি, ঋষ্যশৃঙ্গমুনি, শূর্পনখা, মন্থরা।

মহাভারতের- উপমন্যু, জরাসন্ধ, ধৃতরাষ্ট্র, শিশুপাল।

পুরাণে কুবেরের প্রতিবন্ধকতা স্বরূপ তিন পা, তিন মাথা, চার হাতের উল্লেখ পাওয়া যায়। গনেশের বর্ননায় দেখতে পাই গনেশের মাথাটা হাতির, আবার রামায়নের চরিত্রগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখতে পাই অন্ধকমুনি দৃষ্টিহীন, শূর্পনখার চোখ ট্যারা, বাদামী চুল, কুলোর মতো নখ, বাকি চরিত্রগুলিতেও নানা প্রতিবন্ধকতা দেখা যায়, মহাভারতের উপমন্যু দৃষ্টিহীন, ধৃতরাষ্ট্র দৃষ্টিহীন ও শিশুপালের তিনটি চোখ ও চারটি হাতের বর্ননা আমরা পেয়ে থাকি। পুরান মহাকাব্যের এই বিশেষ দিব্যাঙ্গ চরিত্রগুলির সামাজিক প্রেক্ষাপটগুলি আলোচনা করাও আমাদের প্রকল্পে আরেকটি লক্ষ্য।

(গ) দিব্যাঙ্গ চরিত্র কী সমাজে সাধারণের মতো সমব্যবহার পায়? তা অনুসন্ধানী দৃষ্টি নিয়ে বিশ্লেষণ করে দেখানো।

মানুষ হল সমাজবদ্ধ জীব। সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সুস্থ স্বাভাবিক ভাবে বেঁচে থাকা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়, সমাজের শৃঙ্খলে স্বাভাবিক নিয়ম অনুযায়ী বেঁচে থাকার প্রাথমিক শর্ত হলো পরস্পরিক

সহযোগিতা এবং সহাবস্থান। এই পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহাবস্থানের নীতির উপর ভিত্তি করেই সমাজের মধ্যে মানুষে মানুষে বন্ধন গড়ে ওঠে। তাছাড়াও পৃথিবীতে কোনো মানুষই স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। তাকে নিজের কোনো না কোনো প্রয়োজনে সমাজে কারোর না কারোর উপর নির্ভর করতেই হয়। সে কারনে নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী অপরকে সাহায্য এবং নিজের প্রয়োজন অনুযায়ী সমাজের সাহায্য গ্রহণ, এই পারস্পরিক আদান-প্রদানের মধ্যে এই সমাজের চাকা গতিশীল থাকে।

প্রতিবন্ধীরা নিজেকে সমাজের আলোয় আলোকিত করতে চেয়েছে। প্রতিবন্ধীরা ঘরে বসে নেই। সারা বিশ্বে প্রতিবন্ধীরা এগিয়ে যাচ্ছে। প্রতিবছর ২রা এপ্রিল তারিখে বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস দেশব্যাপী যথাযোগ্য উদযাপন করা হয়ে থাকে। সরকারি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালগুলোতে শিশু বিকাশ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। এবং কেন্দ্রগুলোতে প্রতিবন্ধীদের শিক্ষা দেওয়ার পাশাপাশি তাদের কাজের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। এছাড়াও প্রতিবন্ধী শনাক্তকরণ ও সুচিকিৎসার জন্য চিকিৎসা কেন্দ্র গড়ে তোলা হয়েছে। আমাদের প্রত্যেককেই প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সুযোগ ও সেবার জন্য ভূমিকা পালন করতে হবে, এটা আমাদের নাগরিক দায়িত্ব। এই দায়িত্ব পালন করলেই প্রতিবন্ধী শিশু ও ব্যক্তিরা সমাজের বোঝা হয়ে থাকবে না। তবে এই দায়িত্ব পালনের আগে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রতি আমাদের মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করতে হবে। প্রতিবন্ধকতার সচেতনের বিষয়ে অনেক পথ রয়েছে। পরিবারের শিশু বা যেকোনো সদস্য জন্মের পর থেকে বা যেকোনো বয়সেই অস্বাভাবিক মনে হলে তাদের নিকটবর্তী হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে। তার মধ্যে কোনো প্রকারের প্রতিবন্ধকতা আছে কিনা তা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে নিশ্চিত করতে হবে। কোনো ব্যক্তি প্রতিবন্ধী হলে তাদের ঘরের মধ্যে লুকিয়ে না রেখে সমাজের সাথে মিশতে দিতে হবে। কারণ মুক্ত পরিবেশে জীবনযাপন করার সমান অধিকার সকলের রয়েছে। কিন্তু আমাদের সমাজ কি এই অধিকার আদেও দেয় প্রতিবন্ধীদের?

আমাদের সমাজ সব দিক থেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মানুষজন-ই বেঁচে থাকার ক্ষেত্রে সমান অধিকার পায়। তাই সমাজের কাছে অনুরোধ সুস্থ মানুষদের মতো প্রতিবন্ধীদেরও সুস্থ স্বাভাবিকভাবে বাঁচতে দেওয়া হোক। তারা যেন সমাজের সাথে লড়াই করে সুস্থভাবে বাঁচতে পারে।

বিশ্বের উন্নত দেশ সমূহে প্রতিবন্ধীদের সমস্যার সমাধান হলেও ভারতে এই সকল সমস্যার সমাধানের বিশেষ কোনো চেষ্টা হয়নি। ভারতে প্রতিবন্ধী আছে লক্ষ লক্ষ। তাদের সমস্যার শেষ নেই। তাদের সমস্যা সমাধানের জন্য কোনো উন্নত পরিকল্পনা বা কর্মসূচি গৃহীত হলেও তার সুযোগ সকলে পায় না। এখনও এমন-ই অবস্থা যে, শিক্ষিত অন্ধকে স্কুলের শুধুমাত্র অন্ধত্বের কারণে এই কাজে যোগ

দেওয়া হয় না। আসলে প্রতিবন্ধীরা আজও হয়তো সমাজের প্রতিটি পদক্ষেপে সমান ব্যবহার আশাও করেনা। এই সকল প্রতিবন্ধীরা বা দিব্যাঙ্গরা সমাজে আর পাঁচজনের মতো সমব্যবহার পায় কিনা তাও অনুসন্ধান করা আমাদের প্রকল্পের আরেকটি লক্ষ্য।

(ঘ) নির্বাচিত কথাসাহিত্যের নিরিখে চরিত্রগুলির বর্ণনা ও তাদেরকে নিয়ে গড়ে ওঠা সামাজিক সমস্যার পর্যালোচনা করা।

বাংলা কথাসাহিত্যে দিব্যাঙ্গ চরিত্রের বিপুল আনাগোনা। এই চরিত্র গুলির বর্ণনাও আমাদের প্রকল্পের একটি উদ্দেশ্য। তবে এই বিপুল ভান্ডার থেকে আমরা কয়েকটি গল্প, উপন্যাস বেছে নিয়েছি। সেগুলি হল-

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'রজনী'(১৮৭৫) উপন্যাসের রজনী ছিল দৃষ্টি প্রতিবন্ধী। কিন্তু ভাগ্যের পরিহাসে সে তাঁর এই প্রতিকূলতাকে জয় করতে পেরেছিল।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সুভা'(১২৯৯ বঙ্গাব্দ) গল্পে সুভাষিনী ছিল বাক প্রতিবন্ধী। এই অসহায় মেয়েটির সবই ছিল আদতে কিছুই ছিল না। তাঁর নিজের গর্ভধারিণী মা তাকে পেটের কলঙ্ক বলে মনে করত।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি'(১৯৩৬) উপন্যাসের মালা ছিল পঙ্গু। চলাফেরা না করতে পারলেও ঘরের এক কোনায় বসেই সে তাঁর জীবনের বাঁচার রসদ হিসাবে রূপকথাকে বেছে নিয়েছে। উপন্যাসের শেষে মালা এই প্রতিবন্ধকতাকে জীবন থেকে দূর করতে চাইলেও তাতে সে সফল হয়নি।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'প্রাগৈতিহাসিক'(১৯৩৭) গল্পে ভিকু ছিল শারীরিক প্রতিবন্ধীর শিকার। তাঁর এই প্রতিবন্ধী ছিল হস্ত সংক্রান্ত। তবে এটা তার অর্জিত প্রতিবন্ধী।

মনি মুখোপাধ্যায়ের 'গণতন্ত্র ও গোপাল কাহার'(১৯৭০-৭৯) গল্পে গোপাল ছিল হস্তসংক্রান্ত প্রতিবন্ধী। গণতন্ত্র হত্যার অপরাধে তার জীবনে এই প্রতিবন্ধকতাকে নিয়ে আসে। শেষে সে দৃঢ়প্রতিজ্ঞা করে এই গণতন্ত্রকে রক্ষা করার জন্য সে তার দুটি হাত-ই বিসর্জন দিতে প্রস্তুত।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কুষ্ঠরোগীর বউ'(১৯৪১-৪৩) গল্পে যতীন শারীরিক প্রতিবন্ধীর শিকার, সে কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত। এই রোগ তাকে এক অন্য জগতে নিয়ে গিয়েছিল।

মোহাম্মদ লুৎফর রহমানের ‘সরলা’(১৯১৮) উপন্যাসের সরলা ছিল মানসিক প্রতিবন্ধীর শিকার। অল্প বয়সে যৌবনের তাড়নায় বিপথে চালিত হয়ে তার জীবনে এই প্রতিকূলতা নেমে এসেছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘মালঞ্চ’(১৩৪০ বঙ্গাব্দ) উপন্যাসের নীরজা একদিকে যেমন শারীরিক প্রতিবন্ধী ঠিক অপরদিকে মানসিক প্রতিবন্ধকতাকেও তাকে গ্রাস করেছিল।

আবার বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ‘রাধারানী’(১৮৭৫) উপন্যাসে রাধারানী ছিল মানসিক প্রতিবন্ধীর শিকার। তবে পরবর্তীকালে রাধারানী তার এই প্রতিবন্ধকতাকে জয় করতে পেরেছে।

এছাড়াও, মনীষ ঘটকের ‘পটলডাঙ্গার মাঝি’(১৯৫৬) গল্পগ্রন্থে সমাজের নিম্নবৃত্ত মানুষের শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধকতার ছাপ লক্ষ্য করা যায়।

উপরোক্ত চরিত্রগুলির জীবন অন্বেষণ আমাদের প্রকল্পকার্যের উদ্দেশ্য। এছাড়াও সমাজের তাদেরকে নিয়ে গড়ে উঠা সমস্যাগুলির পর্যালোচনা করাও আমাদের প্রকল্পের উদ্দেশ্য। আসলে সমাজ এমন একটা জায়গা যেখানে একাধিক চরিত্র একত্রে কিছু নিয়ম কানুন প্রতিষ্ঠা করে একত্রে বসবাস করে। এই সমাজই যেমন মানুষকে বেঁচে থাকার রসদ জোগায় আবার এই সমাজ-ই মানুষকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়। বিশেষত, যারা ধরা-বাঁধা নিয়মের বাইরে স্বাভাবিক জীবন যাপনে অক্ষম এককথায় দিব্যাঙ্গ চরিত্রগুলিই আমাদের সমাজে বোঝাস্বরূপ। সমাজের সঙ্গে প্রতিবন্ধকতা নিবিড়ভাবে সম্পর্কযুক্ত, প্রতিটি প্রতিবন্ধী চরিত্র সৃষ্টিতে সমাজের প্রত্যক্ষ পরোক্ষ প্রভাব রয়েছে। সমাজে প্রতিবন্ধীদের অবস্থান অত্যন্ত অবহেলিত। পরিবার থেকে শুরু করে সব জায়গায় প্রতিবন্ধীদের খাটো করে দেখা হয়। আত্মীয়-স্বজন সামাজিক মানমর্যাদার ভয়ে তাদের দূরে সরিয়ে রাখেন। সমাজে তাদের অবাধ চলাচল বাধাগ্রস্ত হয়। শিক্ষা, চাকরি, কর্মসংস্থান, বিয়ে, স্বাস্থ্যসেবা প্রভৃতি ক্ষেত্রে তারা বৈষম্যের শিকার হয়। আমাদের দেশে প্রতিবন্ধীরা কোনো না কোনো ভাবে পরিবারের অবহেলার শিকার। অবহেলার কারণে প্রতিবন্ধকতাকে অভিশাপ মেনে নিয়ে তারা অবহেলিত বঞ্চিত জীবনযাপনে বাধ্য হয়। আমাদের প্রকল্পকার্যের উল্লিখিত প্রতিবন্ধী চরিত্রগুলিও সামাজিক অবহেলার শিকার।

(ঙ) মনোবিশ্লেষণের নিরিখে দিব্যাঙ্গ চরিত্রগুলিকে কেন্দ্র করে তৈরী হওয়া সমস্যাগুলির সমাধান সূত্র খোঁজাও প্রকল্পের উদ্দেশ্য।

দিব্যাঙ্গ চরিত্রগুলিকে কেন্দ্র করে তৈরি হওয়া সমস্যাগুলির সমাধান সূত্র খোঁজা এই প্রকল্পের আর একটি উদ্দেশ্য। চরিত্র বলতে ব্যাক্তিবিশেষের বহিরঙ্গের বৈশিষ্ট্যই নয়, তার অন্তরের সেই ভাবনা,

অভিব্যক্তি ও আচরণকে নির্ধারণ করে। প্রতিবন্ধকতা প্রতিবন্ধী মানুষদের কাছে যতটা না শারীরিকভাবে কষ্টকর তার থেকেও বেশি কষ্টকর সমাজ পরিবেশের আচরণে। সমাজ তাদের দিকে করুনা বা হাসি মজার চোখে দেখে, এই প্রতিবন্ধী মানুষদের মানুষ রূপে গণ্য করে না সমাজ। ভারতে প্রতিবন্ধী অত্যন্ত তীব্র, বিশ্বের উন্নত দেশসমূহে প্রতিবন্ধী সমস্যার সমাধান করা হলেও ভারতে কিন্তু এই সমস্যার সমাধান সঠিকভাবে হয়নি। মানুষকে শ্রদ্ধা ও ঈশ্বররূপে সেবা করার উপদেশ ধর্মশাস্ত্রের পৃষ্ঠাতেই নিবন্ধ। প্রতিবন্ধীদের মধ্যে সুপ্ত রয়েছে আশ্চর্য প্রানশক্তি ও কর্মপ্রতিভা। সুযোগ পেলে যে এদের সুপ্তশক্তি জাগ্রত হয়ে উঠতে পারে, এরাও জীবনে সফল হতে পারে তার প্রমাণ বিশ্ববিজয়িনী হেলেন কেলার। আর পশ্চিমবঙ্গে মূক মুখে ভাষা ফোটা সরকারি পুরস্কারপ্রাপ্ত শিল্পী ঝুমা রায় এবং সাঁতার পদক বিজয়ী মাসদুর রহমান। প্রতিবন্ধীদের প্রতি সমাজের যেমন দায়িত্ব আছে তেমনি ছাত্রদেরও দায়িত্ব-কর্তব্য আছে, তাদেরকে প্রতিবন্ধী মানুষদেরকে সাহায্যের জন্য সর্বদা হাত বাড়াতে হবে। প্রতিবন্ধীদের মনে আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য তাদের চেষ্টা করতে হবে। প্রতিবন্ধীকে হতাশার অন্ধকার থেকে টেনে তুলে নতুন জীবনের পথে নিয়ে যাওয়া আমাদের অন্যতম কর্তব্য। যারা বিকলাঙ্গ দরিদ্রদের জন্য দুমুঠো খেতে পায় না, ছাত্রসমাজ তাদের জন্য অর্থ সংগ্রহ করতে পারে। সুতরাং হাতের কাজের চারু ও কারুশিল্প ইত্যাদি দক্ষতা অর্জনের দিকে গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। ভারতে প্রথম দৃষ্টিহীন IAS Officer হলেন প্রাঞ্জল পাটিল। যিনি একজন দৃষ্টিহীন প্রতিবন্ধী। ছোটবেলা থেকেই তিনি দৃষ্টিহীন। সমস্ত প্রতিকূলতাকে দূরে সরিয়ে রেখে IAS অফিসার হয়ে নজির গড়েছেন প্রাঞ্জল পাটিল। এভাবেই প্রতিবন্ধীরা যদি সমস্ত প্রতিকূলতাকে কাটিয়ে স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জনের ব্যবস্থা করতে পারে, তাহলে তারাও একদিন আত্মনির্ভরশীল হয়ে সুস্থ স্বাভাবিকভাবে জীবন যাপন করতে পারবে।

উপরোল্লিখিত উদ্দেশ্যগুলির কথা মাথায় রেখেই আমরা আমাদের প্রকল্পকার্যটি সম্পন্ন করতে প্রয়াসী হয়েছি।

প্রকল্পের পদ্ধতি

গবেষণা করার অর্থ হলো কোনো বিষয়কে নতুন ভাবে বিশ্লেষণ করা। George J. Mouly প্রকল্পের পদ্ধতিতে বিভিন্ন প্রকারের ভাগ করেছেন। নিম্নে তুলে ধরা হল-

Method of Research:-

- Survey Method
- Historical Method
- Experimental Method

Survey Method:-

- ❖ Descriptive Survey
- ❖ Analytical Survey
- ❖ School Survey
- ❖ Social Survey

Historical Method:-

- ➢ Historical
- ➢ Legal
- ➢ Documentary

Experimental Method:-

- ✓ Simple Experimental Design
- ✓ Multivariate Analysis
- ✓ Case Study
- ✓ Predictive

আমাদের প্রকল্প কার্যের বিষয় 'বাংলা নির্বাচিত সাহিত্যে দিব্যাঙ্গ চরিত্র'। আমরা এই কার্যটি করতে গিয়ে বর্ণনামূলক পদ্ধতির সাহায্য নিয়েছি।

প্রথম অধ্যায়

প্রতিবন্ধকতার স্বরূপ ও প্রকৃতি

প্রতিবন্ধী কাকে বলা হয়? যে মানুষের সাধারন মানুষের যা যা কর্মক্ষমতা থাকে সেগুলি থেকে বঞ্চিত তাদেরকেই প্রতিবন্ধী বলা যায়। কিন্তু সব মানুষই কি সব কাজ করতে পারে? না পারে না, আসলে বয়স, লিঙ্গ, জাতি, সংস্কৃতি বা সামাজিক অবস্থান সার্বিক অবস্থা অনুযায়ী আর পাঁচ দশজন সাধারন মানুষ যে কাজগুলি করতে পারে, বিশেষ কোনো কারনে তথা অক্ষমতার দরূন কোনো মানুষ যখন তার প্রাত্যহিক জীবন যাপনের স্বাভাবিক ক্রিয়াকর্মগুলি নির্বাহ করতে পারে না, তখন তার সেই বিশেষ অবস্থাকে প্রতিবন্ধী বলা হয়। আবার অক্ষমতা বলতে দেহের বিশেষ কোনো অংশ বা অঙ্গ বা তন্ত্রের আংশিক বা সম্পূর্নরূপে ক্ষনস্থায়ী বা চিরস্থায়ী ভাবে স্বাভাবিকভাবে কার্যক্ষমতা লুপ্ত হবার অবস্থাকেই বোঝায়, এই বিশেষ অবস্থার মানুষদের প্রতিবন্ধী নামে চিহ্নিত করে থাকে সমাজ পরিবেশ।

আগে এই অক্ষম মানুষদের ‘প্রতিবন্ধী’ বলে চিহ্নিত করা হত। কিন্তু বর্তমানে এই ‘প্রতিবন্ধী’ শব্দটি পরিহার করতে চায় সমাজ। তাই বর্তমানে তাদের ‘প্রতিবন্ধী’ না বলে ‘বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন’ বা ‘দিব্যাঙ্গ’ মানুষ রূপে পরিচয় করানো হয়, এতে আপাতত সমাজের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির কিছুটা বদল ঘটে। এইসকল মানুষেরা আজ বিভিন্ন উন্নতি প্রযুক্তির সাহায্যে তাদের প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে চলেছে। এখানে সবচেয়ে বড় শক্তি হল মানসিক শক্তি তাই ওই শক্তির আরও বৃদ্ধির জন্য এবং সমাজে কোনো নেতিবাচক প্রভাব না ফেলার জন্য তাই ‘প্রতিবন্ধী’ শব্দটির পরবর্তে নতুন সংযোজন হয় ‘বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন’ বা ‘বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তি’।

প্রতিবন্ধকতার তত্ত্বগত দিকটি আলোচনা করা যেতে পারে মূলত এই ভাবে-

১) প্রতিবন্ধকতার স্বরূপঃ-

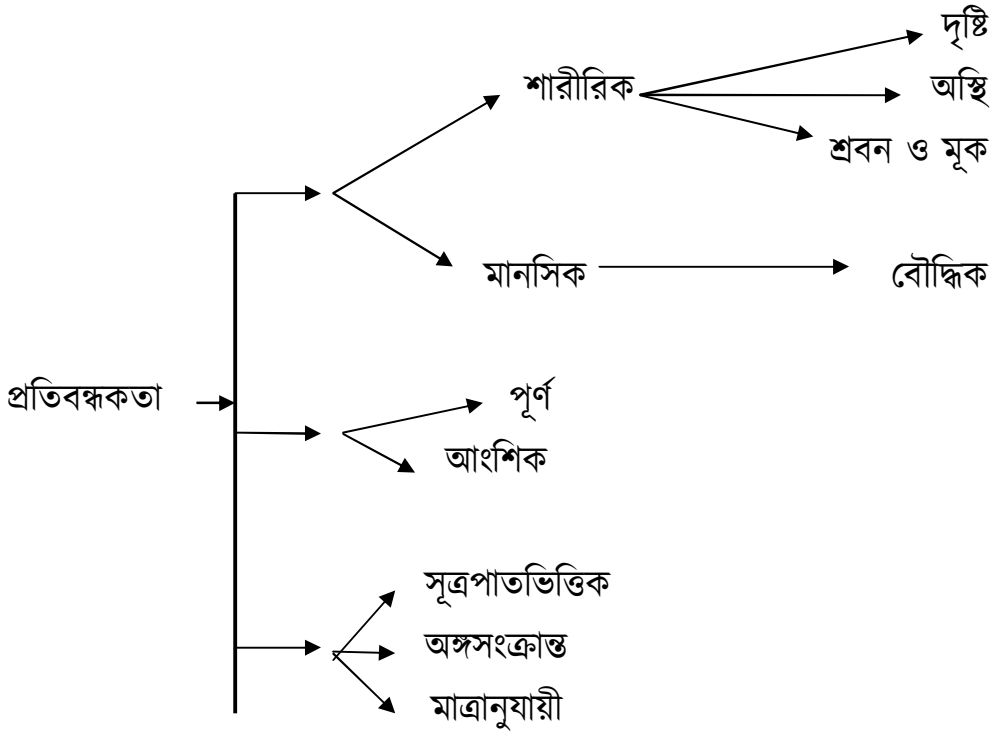

২) প্রতিবন্ধকতার কারনঃ-

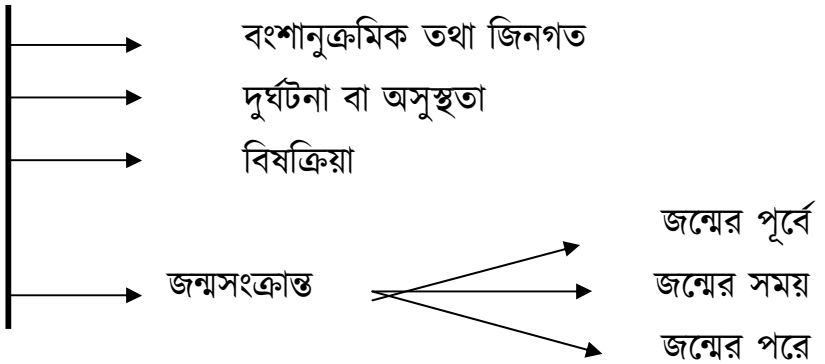

১) প্রতিবন্ধকতার স্বরূপঃ-

প্রতিবন্ধকতা বিভিন্ন প্রকারের হতে পারে তার শ্রেনীবিভাগ গুলি নিম্নে আলোচিত করা হল-

শারীরিকঃ-

যখন কোনো ব্যক্তি মানুষের দৈহিক অক্ষমতার কারনে তার স্বাভাবিক জীবন যাপনে বাধাপ্রাপ্ত হয় তখন তাকে শারীরিক প্রতিবন্ধী বলে।

শারীরিক প্রতিবন্ধী আবার বিভিন্ন রকমের হয় দৃষ্টি, অস্থি, শ্রবন ও মূক।

দৃষ্টি সংক্রান্ত

আমেরিকার মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের সংজ্ঞায় বলেন, যে সমস্ত ব্যক্তির সবচেয়ে ভালো চোখ বা লেন্স ব্যবহারের পরেও ভিস্যুয়াল অ্যাকুইটি২০/২০০ বা তারও কম অথবা ব্যক্তির ভালো চোখের দৃষ্টি ক্ষেত্র ২০ বা এর কম তাদের বলে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী।

দৃষ্টিহীন মানুষদের মূলত দুটি শ্রেনীতে বিভক্ত কারা যায়-

ক) সম্পূর্ন দৃষ্টিহীন

খ) আংশিক দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন

চিকিৎসাবিদ্যা অনুসারে বিশ্বে দুটি প্রতিবন্ধকতার সবচেয়ে সাধারন কারন হল প্রতিসরন ত্রুটি (৪৩%), ছানি (৩৩%) এবং গ্লুকোমা (২%)। প্রতিসরন ত্রুটির মধ্যে রয়েছে নিকট দৃষ্টি, দূরদৃষ্টি, প্রেসবায়োপিয়া, এবং দৃষ্টিভঙ্গ। ছানি অন্ধত্বের সবচেয়ে সাধারন কারন। অন্যান্য ব্যাধি যা চাক্ষুষ সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে, তার মধ্যে রয়েছে ডায়বেটিক, বয়স সম্পর্কিত ম্যাকুলার অবক্ষয়, শৈশব অন্ধত্ব আরও কিছু সংক্রমন। এছাড়াও স্টোক, অপরিনত জন্ম, মস্তিস্কের সমস্যা দুরারোগ্য রোগ, অপুষ্টি শরীরে ভিটামিন-এ, বি, বি-২, সি এবং ডি-এর অভাবের কারনেও দৃষ্টি প্রতিবন্ধী দেখা যায়।

ভারতের Rehabilitation Council of India Act (১৯৯২) অনুসারে দৃষ্টি সংক্রান্ত প্রতিবন্ধকতার তিনটি স্তর-

i) **স্বল্প দৃষ্টিমানঃ-** আলোকিত ব্যবস্থা ও বিশেষ কিছু ধরনের সাজসরঞ্জামের সহায়তায় এরা প্রায় স্বাভাবিক দৃষ্টিমান মানুষের মতো কাজকর্ম করতে সক্ষম হয়।

ii) **আংশিক দৃষ্টিমানঃ-** দৃষ্টি সহায়ক সাজসরঞ্জামের সহায়তাতেও এরা স্বাভাবিক নির্ভূল কাজকর্ম করতে পারেনা।

iii) **দৃষ্টিহীনঃ-** দৃষ্টির দ্বারা এরা কোনো কাজকর্ম করতে সক্ষম হয় না, এদের কাজকর্ম চালানোর জন্য একমাত্র ভরসা শ্রবন শক্তি ও স্পর্শক্ষমতা।

বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা WHO (World Health Organisation) এর মতে, যাদের দৃষ্টিক্ষমতা ২০/৯০ এবং ২০/৮০০ যা বিভিন্ন চেষ্টার মাধ্যমে এবং উপযুক্ত চিকিৎসামূলক সুযোগ সুবিধা দ্বারা সক্ষমতার পর্যায়ে জানা যায়, তাদের ক্ষীন দৃষ্টিশক্তিসম্পন্নতা শ্রেনিভুক্ত করা যায়। আর যে সব মানুষদের দৃষ্টিক্ষমতা ২০/৮০০ এর মধ্যে এবং দৃষ্টিক্ষেত্র ১০ ডিগ্রির কম WHO তাদের দৃষ্টিহীনতার পর্যায় ভুক্ত করে।

শ্রবন ও মূক

যেসব মানুষেরা কানে শুনতে পায় না তাদের বলা হয় বধির এবং যে মানুষ কথা বলতে পারে না তাদের বলা হয় মূক বা বোবা।

বধিরতার কারনঃ-

মানুষের কর্ণের বিভিন্ন প্রকার ত্রুটির কারণে শ্রবণ প্রতিবন্ধকতা ঘটে থাকে। জিনগত কারণে কিছু কিছু শিশুর বধিরতা জন্মের পূর্বেই নির্ধারিত হয় আবার কিছু কিছু জন্মের পর পরবর্তীকালে বিভিন্ন ভাইরাসের সংক্রমণ, অতিরিক্ত মাত্রায় ঔষুধ সেবন, বাহ্যিক আঘাত, শব্দ দূষণ প্রভৃতি কারণে শ্রবণশক্তি হারায়।

মূকত্বের কারনঃ-

স্বরযন্ত্রের ত্রুটি মূকত্বের প্রধান কারণ হলেও অনেক সময় দুর্ঘটনা বা মানসিক আঘাত থেকেও মূকত্বের শিকার হয় মানুষ। এছাড়াও শ্রবণাঙ্গের ত্রুটির কারণে মানুষ শুনতে পায় না। তাই তারা অন্যের কথাও বুঝতে পারে না এবং তাদের ভাষার বিকাশ হয় না। অর্থাৎ তারা কথা বলতে পারে না সুতরাং মূকত্বের কারণগুলি হলো-

i. স্বরযন্ত্রের ত্রুটি
ii. দূর্ঘটনা
iii. মানসিক আঘাত
iv. শ্রবনাঙ্গের ত্রুটি

শ্রবন সংক্রান্ত প্রতিবন্ধকতার স্তরঃ-

i. ০-২৬ ডেসিবেল- স্বাভাবিক শ্রবনক্ষমতাসম্পন্ন।
ii. ২৭-৪০ ডেসিবেল- অতিসামান্য শ্রবনহীনতা
iii. ৪১-৫৫ ডেসিবেল- স্বল্পমাত্রায় শ্রবনহীনতা।
iv. ৫৬-৭০ ডেসিবেল- মধ্যম মাত্রায় শ্রবনহীনতা
v. ৭১-৯০ ডেসিবেল- গুরুতর মাত্রায় শ্রবনহীনতা বা বধির।
vi. ৯০ ডেসিবেলের উর্ধ্বে- গভীর মাত্রায় বধিরতা।

বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা WHO (World Health Organisation) এর মতে বধির ব্যাক্তিদের মূল সমস্যা শ্রবনেন্দ্রিয়ের অভ্যন্তরীণ সমস্যা এবং শ্রবনেন্দ্রিয়ের শ্রবনমূলক সংবেদনের গ্রহণযোগ্য অক্ষমতা, এই সমস্যার জন্যই তারা সমাজের সঙ্গে সঠিকভাবে সংযোগ সাধন করতে সক্ষম হয় না।

তার ফলস্বরূপ, তাদের সামাজিক কার্যকারিতাও অনেকাংশে ব্যাহত হয়। তবে বর্তমানে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ, যথাযথ শিক্ষা এবং আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে এই সমস্যা অনেকাংশে লাঘব হয়েছে।

তাই বলা যায়, মূকত্বের অনেক কারনের মধ্যে একটি অন্যতম প্রধান কারণ হল বধিরতা, তবে সবক্ষেত্রে যে বধির মাত্রই মূক হবে তা বলা যায় না। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মূক ও বধির মানুষই দেখা যায়।

অস্থি সংক্রান্ত

বিভিন্ন কারণে যখন কোন স্বাভাবিক মানুষ শারীরিক অক্ষমতার শিকার হন তখন তাকে অস্থিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধী বলা হয়ে থাকে। এর মধ্যে রয়েছে পোলিও পরবর্তী পক্ষাঘাত, একপার্শীয় পক্ষাঘাত, উভয় পার্শীয় পক্ষাঘাত, এক বা একাধিক আঙ্গুলহীনতা ইত্যাদি। বিভিন্ন রকম গঠনমূলক ও ক্রিয়ামূলক ভিত্তিতে অঙ্গসংক্রান্ত প্রতিবন্ধীকতার চারটি পর্যায়-

i. ২৫% এর কম
ii. ২৫% - ৭৫%
iii. ৭৫% - ৯০%
iv. সম্পুর্ন অসামর্থ।

মানসিক প্রতিবন্ধকতা

আমেরিকান অ্যাসোসিয়েশন অফ মেন্টাল রিটার্ডেশন (AAMR) এর মতে বর্তমান অবস্থায় কাজকর্মে যথেষ্ট অক্ষম এবং সেই সঙ্গে স্বাভাবিকের তুলনায় বুদ্ধিবৃত্তি অতি অল্প, তা ছাড়া অন্যের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন, নিজের পরিচর্যা নিজে করা, পরিবারের অন্যদের সঙ্গে মিলেমিশে থাকা, মিলেমিশে বসবাস করা, সামাজিক তৎপরতা, নিজেকে সঠিকভাবে পরিচালনা, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা, পড়াশুনা, অবসর বিনোদন ইত্যাদি আনুষাঙ্গিক প্রতিযোজক আচরনেও সীমাবদ্ধতা বা প্রতিবন্ধকতা লক্ষ্য করা যায় তারাই হল মানসিক প্রতিবন্ধী, এই অবস্থার নাম মানসিক প্রতিবন্ধকতার।

মানসিক প্রতিবন্ধকতার কারনঃ-

- জন্মগত
- গর্ভকালীন সমস্যা
- মা অপুষ্টি এবং পুষ্টিহীনতায় ভুগলে
- মায়ের ডায়াবেটিস, মানসিক ও শারীরিক রোগ থাকলে

➢ নিম্নসামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থাও কোন কোন সময় শিশুর মানসিক প্রতিবন্ধীকতার কারণ হতে পারে।

মানসিক প্রতিবন্ধকতার শ্রেনীবিভাগঃ-

৯০ থেকে ১১০ বুদ্ধ্যঙ্ক (IQ) যাদের সেই মানুষদের স্বাভাবিক বুদ্ধ্যঙ্ক বলা হয়। যদি কারো বুদ্ধ্যঙ্ক(IQ) ৯০ এর নীচে এবং ৭০ এর উপরে হয় তবে সেই মানুষকে প্রান্তিক অবস্থায় আছে বলে ধরা হয়। বুদ্ধ্যঙ্ক বিচারে এই সমস্ত ব্যক্তিদের একটু চেষ্টা করলে স্বাভাবিক জীবনযাপনে পারদর্শী হয়ে উঠতে পারে। যাদের বুদ্ধ্যঙ্ক(IQ) ৭০ এর নীচে তাদেরই মানসিক প্রতিবন্ধী হিসেবে ধরা হয়। মনোবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এই ৭০ এর নীচে বুদ্ধ্যঙ্ক ব্যাক্তিদের চারটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়-

বুদ্ধ্যঙ্ক(IQ)	**মানসিক প্রতিবন্ধী**
২০-২৫ এর নীচে	অতি তীব্র প্রতিবন্ধকতা
২০-২৫ থেকে ৩৫-৪০	তীব্র প্রতিবন্ধকতা
৩৫-৪০ থেকে ৫০-৫৫	মধ্যম প্রতিবন্ধকতা
৫০-৫৫ থেকে ৭০	মৃদু প্রতিবন্ধকতা

মানসিক প্রতিবন্ধকতার ক্ষেত্রে সামাজিক পরিস্থিতি উপলব্ধি করার ক্ষমতা থাকে না, তাই এরা সমাজের সাথে মিশতে পারে না।

প্রতিবন্ধকতার আরও দুটি ভাগঃ-

i. পূর্ন
ii. আংশিক

অনেক সময় প্রতিবন্ধকতার আঘাত পূর্ণ হয়। যেমন দুটি চোখেই দৃষ্টিশক্তি হীন কিংবা সম্পূর্ণ দুটি পা-ই ক্ষতিগ্রস্ত। আবার কখনো আঘাত আংশিক হয়। যেমন দৃষ্টিশক্তি পুরোপুরি অন্ধকারে চলে যায় না চোখে অল্প দেখতে পাচ্ছে অথবা দুটি পায়ের একটি পা ক্ষতিগ্রস্ত হলেও আর একটি পা সবল রয়েছে, আসলে সব ক্ষেত্রেই এই দুটি রূপের প্রকারই লক্ষণীয়।

সূত্রপাত ভিত্তিক

সাধারণত সব শিশুই যে সুস্থভাবে পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হয়, অনেক সময় তা নাও হতে পারে, জন্ম থেকেই অনেক শিশু প্রতিবন্ধকতাকে নিয়ে জন্মলাভ করে। আবার অনেক সময় এমনও হয় যে, সুস্থ স্বাভাবিক শিশু জীবনে চলার পথে বিশেষ কোনো কারণে প্রতিবন্ধকতার শিকার হয়, তাই হিসেবে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়-

i. প্রাথমিক প্রতিবন্ধকতাঃ- একটি শিশু যখন প্রতিবন্ধকতাকে সঙ্গে নিয়ে জন্মলাভ করে তখন শিশুটি ওই শ্রেণীর পর্যায়ভুক্ত হয়।

ii. অর্জিত প্রতিবন্ধকতাঃ- যখন কোনো শিশু জন্মের সময় সুস্থ অবস্থায় জন্মলাভ করলেও পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন কারণে প্রতিবন্ধকতার শিকার হয় তখন ওই শিশুটিকে এই শ্রেণীর পর্যায় ভুক্ত করা হয়।

অঙ্গ সংক্রান্ত

পঞ্চইন্দ্রিয় চক্ষু, কর্ন, জ্বিহা, নাসিকা, ত্বক এদের মধ্যে নাসিকা ও ত্বক বাদ দিয়ে অন্য যে কোনো একটি অঙ্গহানি ঘটলে কোনো ব্যক্তি প্রতিবন্ধীর শিকার হয় এই প্রতিবন্ধকতাকে কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়-

i. চলন গমন সংক্রান্ত প্রতিবন্ধী।
ii. হস্ত জনিত প্রতিবন্ধী
iii. দৃষ্টি সংক্রান্ত প্রতিবন্ধী
iv. শ্রবণ সংক্রান্ত প্রতিবন্ধী
v. বাক প্রতিবন্ধী

মাত্রানুযায়ী

অক্ষমতা (Impairment) সব ক্ষেত্রে সমান থাকে না, মাত্রার তারতম্য হয়েই থাকে। এই মাত্রাগুলিকে আবার কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়-

i) মৃদু iii) তীব্র
ii) মাঝারি iv) চরম

প্রতিবন্ধকতার কারন

সমাজে প্রতিটি মানুষের প্রতিবন্ধকতার ক্ষেত্রে কোন না কোন কারণে নিহিত থাকে, শারীরিক বা মানসিক সবক্ষেত্রেই প্রতিবন্ধকতার পিছনে কোনো কারণ রয়েছে। সেই কারণগুলি হল-

বংশানুক্রমিক তথা জিনগতঃ- চিকিৎসা শাস্ত্রানুযায়ী বলা হয়ে থাকে, রক্তসম্পর্কের নিকট কোনো আত্মীয়ের মধ্যে বিবাহ হলে তখন তাদের সন্তান প্রতিবন্ধী হয়। আবার যদি কোন সন্তানের পিতা-মাতা থ্যালাসেমিয়া বা হিমোফিলিয়া প্রভৃতি রোগে আক্রান্ত হয় তবে তাদের সন্তানও ওই একই রোগে আক্রান্ত হয়।

দূর্ঘটনা বা অসুস্থতাঃ- যে কোন দূর্ঘটনায় মানুষের অঙ্গহানি ঘটে, যেমন বাস দূর্ঘটনায় কোনো ব্যক্তি কোনো অঙ্গহানি ঘটলে ওই ব্যক্তি ওই পর্যায়ভুক্ত হয়।

বিষক্রিয়াঃ- বিষক্রিয়ায় শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়াগুলি সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান গুলির অভাব থাকলেও মানুষ প্রতিবন্ধীর শিকার হয়। যেমন-

i. পুষ্টির অভাব
ii. ভিটামিনের অভাব
iii. আয়োডিনের অভাব

জন্ম সংক্রান্তঃ-

কোন শিশু জন্ম লাভের প্রক্রিয়ার উপর নির্ভর করেও শিশু প্রতিবন্ধী হয়। তাই এই পর্যায়টিকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়-

ক) জন্মের পূর্বেঃ- দেবীর আরাধনার পূর্বে যেমন পূজার জোগাড় করাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ তেমনি শিশুকে সুস্থ স্বাভাবিক ভাবে ভূমিষ্ঠ করানোর জন্য মায়ের গর্ভাবস্থাতে বা গর্ভধারণের আগে বেশ কিছু সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়। সেগুলি হল-

o মায়ের বয়স যদি ১৬ বছরের নীচে অথবা ৩০ বছরের বেশি হয় তাহলে শিশুর সুস্থতার বিষয়টিতে হানি ঘটতে পারে।

o গর্ভাবস্থায় মায়ের পুষ্টির অভাব ঘটলে শিশুর স্বাস্থ্যের তার উপর প্রভাব পড়ে।

o গর্ভাবস্থার প্রথম তিন মাস খুব গুরুত্বপূর্ণ, তাই এই সময় মা যদি কোনো কড়া ওষুধ, বিষক্রিয়া, অনিয়মিত লাইফস্টাইল এর মধ্যে দিয়ে যায় তাহলে সন্তানের ক্ষতি হতে পারে।

o গর্ভবতী মায়ের যদি হৃদরোগ থাকে তাহলে শিশুর সুস্থতায় তার প্রভাব পড়ে।

o গর্ভাবস্থায় মা যদি ডায়াবেটিস রোগে আক্রান্ত হয় তাহলে শিশুটি বিকলাঙ্গ হতে পারে।

o গর্ভাবস্থায় মা যদি তামাক, ধূমপান, মাদকাসক্ত প্রভৃতি নেশাগ্রস্ত হয় তাহলে শিশু বিকলাঙ্গ হতে পারে।

খ) জন্মের সময়ঃ- জন্মের পূর্বে মা-কে যেমন সচেতন থাকতে হয় তেমনি জন্মের সময়টিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, এই সময় কিছু বিষয়ে সচেতন থাকা প্রয়োজন।

o শিশুর জন্মের যথার্থ সময়ের পূর্বে প্রসব করালে শিশুটির মধ্যে অস্বাভাবিকতা লক্ষ্য করা যায়।

o প্রসবের সময় অশিক্ষিত কর্মী দ্বারা প্রসব করানো হলে অব্যবস্থাপনায় শিশুটি বিকলাঙ্গ হতে পারে।

o প্রসবের সময় শিশুর মাথায় আঘাত পেলে শিশুর বিকলাঙ্গের ঝুঁকি থাকে।

o উন্নতমানের যন্ত্রপাতি ব্যবহার না করলেও শিশু বিকলাঙ্গ হতে পারে।

o শিশুর জন্মের সময় অক্সিজেনের ঘাটতি দেখা দিলেও শিশুটি বিকলাঙ্গ হতে পারে।

গ) জন্মের পরেঃ- জন্মের পূর্বে ও জন্মের সময় যেমন সচেতন থেকে সুস্থ শিশুর জন্ম দেওয়া হয়। ঠিক তেমনি জন্মের পরেও বেশ কিছু বিষয়ে নজর রাখা দরকার, না হলেও শিশুটি প্রতিবন্ধকতার শিকার হতে পারে। যেমন-

o জন্মের সময় শিশুর মাথা খুব নরম হয়, তাই ভালো করে লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে শিশুর মাথায় কোনো আঘাত না লাগে।

o পোলিও টিকাকরণ সঠিক সময়ে করানো।

o অক্সিজেনের অভাবে রক্ত পরিসঞ্চালনে বাধাপ্রাপ্ত হয়, তাই অক্সিজেনের সুষ্ঠ যোগান রাখতে হবে।

o শিশুর ক্ষেত্রে ওষুধ প্রয়োগের সময় বিশেষ সতর্কতা গ্রহণ বাঞ্ছনীয়, ওষুধ প্রয়োগের মাত্রার তারতম্যের ফলেও শিশুর উপর মারাত্মক প্রভাব পড়ে।

তাই সবশেষে আমরা বলতে পারি যে কারণেই হোক না কেন, কোন ব্যক্তির শারীরিক বা মানসিক যে কোনো দিকের যদি অঙ্গহানি ঘটে তাহলে ওই ব্যক্তিটি প্রতিবন্ধীকতার শিকার হয়। এই অধ্যায়ের আমরা এই সকল প্রতিবন্ধীদের স্বরূপ ও প্রকৃতি নিয়ে যথাসম্ভব আলোচনার চেষ্টা করেছি।

দ্বিতীয় অধ্যায়

পুরাণ মহাকাব্যে প্রতিবন্ধী চরিত্রের প্রয়োগঃ-

পুরাণ বা পৌরানিক কাহিনী হল সমাজে প্রচলিত লোক কাহিনীর একটা প্রাচীন প্রকারভেদ। এই পৌরানিক কাহিনী গুলিতে অনেক বিশেষ বিশেষ চরিত্র রয়েছে। তাদের মধ্যে কিছু কিছু চরিত্র রয়েছে দিব্যাঙ্গ চরিত্র। তবে শুধু আমাদের দেশ নয়, দেশ-বিদেশের পুরাণ মহাকাব্যগুলিতেও দিব্যাঙ্গ চরিত্র রয়েছে। সেইসব চরিত্রগুলি কেমন তা দেখানোর চেষ্টা করেছি এই অধ্যায়ে। সাহিত্য তো আসলে সমাজের দর্পন। তৎকালীন সমাজব্যবস্থায় এই বিশেষ মানুষগুলির সামাজিক অবস্থায় প্রতিবন্ধী চরিত্রগুলি কীভাবে তাদের প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে উঠেছিল তা তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

এই অধ্যায়ে নির্বাচিত দিব্যাঙ্গ চরিত্রঃ-

পুরাণঃ- গনেশ, জগন্নাথ, কুবের, জড়ভরত।

রামায়নঃ- অন্ধকমুনি, ঋষ্যশৃঙ্গমুনি, শূর্পনখা, মন্থরা।

মহাভারতঃ- উপমন্যু, জরাসন্ধ, ধৃতরাষ্ট্র, শিশুপাল।

উপরিউক্ত চরিত্রগুলির মধ্যে যে প্রতিবন্ধকতা রয়েছে তা নিম্নে আলোচনা করার চেষ্টা করেছি এবং তাদের সামাজিক অবস্থান তুলে ধরেছি।

গনেশ (পুরাণ):-

সিদ্ধিদাতা গনেশের কথা পুরাণ ও মধ্যযুগীয় সাহিত্যে পাওয়া যায়। পৌরানিক হিন্দুধর্মে গনেশ সর্বাঙ্গে পূজ্য, গনেশের উল্লেখ রয়েছে শিবপুরাণ, স্কন্দপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, পদ্মপুরাণ ইত্যাদিতে। এছাড়াও রামায়ন, মহাভারতেও গনেশের উল্লেখ রয়েছে। অবশ্যই উল্লেখ্য গনেশ পুরান। গনেশের জন্মকথায় পাওয়া যায় গনেশের মাথাটা হাতির মতো, গনেশের জন্ম বিষয়ে একাধিক উপাখ্যান প্রচলিত আছে।

শিবপুরান থেকে জানতে পারি একদিন দেবী পার্বতী কৈলাসে স্নানাগারের বাইরে তিনি নন্দীকে দাঁড় করিয়ে রেখে ছিলেন, যাতে তাঁর স্নানের সময় কেউ ভিতরে ঢুকতে না পারে। এই সময় শিব

ভিতরে প্রবেশ করতে চাওয়ায়, নন্দী শিবের বাহন হওয়ায় তিনি প্রভুকে বাধা দিতে পারলেন না, তখন পার্বতী রেগে গেলেন, তিনি তাঁর প্রসাধনের হলুদমাখা কিছুটা নিয়ে গনেশকে সৃষ্টি করলেন এবং গনেশকে নিজের অনুগত পূত্ররুপে ঘোষনা করলেন, এরপর থেকে পার্বতী স্নানাগারের বাইরে গনেশকে দাঁড় করাতেন। একবার শিব এসে ভেতরে প্রবেশ করতে চাইলে গনেশ তাকে বাঁধা দেন, শিব গনেশকে হত্যা করার আদেশ দেন। কিন্তু কেউ গনেশের ক্ষতি করতেও সক্ষম হল না। তখন শিব নিজে গনেশের সাথে যুদ্ধ করে তার মুন্ড কেটে তাকে হত্যা করলেন । একথা পার্বতী জানতে পেরে সৃষ্টি ধ্বংস করতে উদ্যোগী হলেন, তখন সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা তাঁর কাছে ক্ষমা চাইলেন, তখন শিব ব্রহ্মাকে উত্তর দিকে পাঠিয়ে বললেন, যে প্রাণীটিকে প্রথম দেখতে পাবে তার মাথাটি কেটে আনবে। ব্রহ্মা তখন এক হাতির মাথা নিয়ে ফিরে এলেন, শিব সেই মাথাটি গনেশের দেহে স্থাপন করলেন এবং প্রাণ প্রতিষ্ঠা করলেন। শিব গনেশকে নিজ পুত্র ঘোষনা করলেন এবং সকল দেবতার আগে পূজার ব্যবস্থা করে দিলেন।

আবার ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে গনেশের জন্ম হয়েছিল অন্যভাবে। শিব ও পার্বতী পূত্রলাভের আশায় বর্ষকব্যাপী পূণ্যক ব্রত ও বিষ্ণপূজা করে ছিলেন। তাঁর ব্রতে তুষ্ট হয়ে বিষ্ণু পার্বতীর পুত্ররুপে অবতীর্ন হন। পার্বতীর গর্ভে এক পুত্রসন্তানের জন্ম হয়। সকল আবার ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে গনেশের জন্ম হয়েছিল অন্যভাবে। দেবদেবী আনন্দে মেতে ওঠে। কিন্তু শনি এই পুত্রটির দিকে তাকাতে ইতস্তত হন। কারন শনির দৃষ্টি অমঙ্গলজনক, কিন্তু পার্বতীর অনুরোধে শিশুটির দিকে তাকাতেই শিশুর মস্তক ছিন্ন হয়ে যায়। শিব ও পার্বতী দুজনেই শোকাহত হন। তখন বিষ্ণু হস্তিশিশুর মাথা নিয়ে আসেন। হাতির মাথাটি শিশুর মুন্ডহীন দেহে বসিয়ে তাঁর প্রান ফিরিয়ে আনে। এই শিশুটির নাম রাখা হয় গনেশ।

গনেশের মাথাটি হাতির মতো হবার জন্য শারীরিক প্রতিবন্ধকতার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রতিবন্ধকতা থাকলেও দেবতা রুপে পূজা করা হয়।

জগন্নাথ (পুরাণ):-

ভারতের মুলত ওড়িশা, ছত্রিশগড় অঞ্চলের জগতের নাথ জগন্নাথ। জগন্নাথ মূর্তির চোখ দুটি বিশাল বড়ো বড়ো এবং গোলাকার, হাত অসম্পূর্ন, মূর্তিতে কোনো পা নেই। জগন্নাথের এরূপ মূর্তির কাহিনী রয়েছে।

কাহিনী হল 'রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের কাহিনী'। কৃষ্ণভক্ত রাজা সমুদ্রে ভেসে আসা কাষ্ঠখন্ড দ্বারা মূর্তি নির্মানের আদেশ পান। দেবশিল্পী বিশ্বকর্মাও কাষ্ঠশিল্পীর রূপ ধরে মুর্তি নির্মান শুরু করেন। শর্ত ছিল মন্দির বন্ধ করে মূর্তি নির্মান চলবে। কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত কারো কোনো হস্তক্ষেপে কাষ্ঠশিল্পীর নিষেধাজ্ঞা ছিল। কিন্তু একদিন রানী কৌতুহল চেপে রাখতে না পেরে দরজার বাইরে থেকে কোনো আওয়াজ শুনতে না পেয়ে বন্ধ দরজা খুলে ভিতরে প্রবেশ করেন। সাথে সাথে দেখেন মূর্তি অর্ধসমাপ্ত এবং কাষ্ঠশিল্পী অন্তর্ধিত। তখন রাজা ও রানী বিমর্ষ হয় পড়লে নারদ রাজাকে সান্তনা দিয়ে বলেন এই অর্ধসমাপ্ত মূর্তিই পরমেশ্বরের এক স্বীকৃত স্বরূপ। এই কাহিনী থেকে আমরা জগন্নাথের প্রতিবন্ধকতার পরিচয় পেয়ে থাকি।

কুবের (পুরাণ):-

দশদিকপালের আন্যতম ধনাধিপতি কুবের যক্ষ। পৌরানিক কাহিনী আনুসারে কুবেরের পা তিনটি ও দন্ত আটটি ছিল। একদা হিমালয়ে তপস্যার সময়ে দেবী রূদ্রানীকে দর্শন করে ফেলায় কুবেরের বামচক্ষু পিঙ্গলবর্ন এবং ডানচক্ষু দগ্ধ হয়ে যায়। এই জন্য কুবেরের অপর নাম একপিঙ্গল। পরবর্তী কালে মহাদেব কুবেরের কঠোর তপস্যায় মুগ্ধ হয়ে তাঁকে রক্ষা করেন। তিনি দশদিকপাল হিসাবে বিবেচিত হন এবং উত্তরদিকের অধিষ্টাতা হিসাবে পূজিত হন।

পৌরানিক বর্নানুসারে তাঁর তিনটি পা, একটি চোখ ও মাত্র আটটি দাঁত রয়েছে। এছাড়াও তাঁর মূর্তি অলঙ্কারবিভূষিত হয়ে থাকতে দেখা যায়। কুবেরের বিবরনে প্রতিবন্ধকতা স্বরূপ কমসংখ্যক দাঁত, তিন পা, তিন মাথা, ও চার হাতের উল্লেখ পুরাণ পরবর্তী সময়েও পাওয়া যায়।

অন্ধকমুনি (রামায়ন):-

অন্ধকমুনি ও তাঁর পত্নী দুজনেই ছিলেন দৃষ্টিহীন, তাঁদের পুত্র সিন্ধু অন্ধকার রাত্রে নদীতে কলসী ভরতে যায়। নদীতে কলসী ডোবানোর শব্দ শুনে হরিনের জলপানের শব্দ মনে করে রাজা দশরথ বান নিক্ষেপ করে। সেই বানে সিন্ধু নিহত হলেন। এই শোক সহ্য করতে না পেরে মুনিদম্পতি দশরথকে অভিশাপ দিয়ে প্রান ত্যাগ করেন।

অন্ধকমুনির মুখেই আমরা জানতে পারি, তাঁর এই প্রতিবন্ধকতা জীবনের কাহিনী। একদিন ত্রিজটা মুনি তাঁর গৃহে ভিক্ষা করতে এলে পিতার আদেশে অন্ধক ত্রিজটা মুনি পদধূলি গ্রহন

করতে যায় কিন্তু ত্রিজটা মুনির পা দেখে ঘৃনায় চোখ বন্ধ করে পদধূলি গ্রহন করেন। এই শ্রদ্ধাহীনতায় মুনি ও মুনিপত্নীর অন্ধত্বের কারন।

ঋষ্যশৃঙ্গ (রামায়ন):-

রামায়নের কাহিনীতে আমরা দেখতে পাই, রাজা দশরথের জামাতা আর স্বর্নমুখীর পুত্র। স্বর্নমুখী মৃগীরূপে বিচরন করতেন। একদিন স্বর্গের এক অপ্সরা ঊর্বশীকে দেখে হ্রদেই স্নানরত বিভান্ডক কামার্ত হয়ে পড়েন আর সেই হ্রদের জল মৃগীরূপী স্বর্নমুখী পান করায় গর্ভবতী হয়ে পড়ে, এবং যথাসময়ে এক শিশুর জন্ম হয়, যার মাথায় স্বর্নরূপের শৃঙ্গ বর্তমান। এই শিশুই ঋষ্যশৃঙ্গ নামে পরিচিত।

বিকৃতদেহ শিশু পিতার তপোবনে কৌশিকী নদীর তীরে প্রতিপালিত হতে থাকে। কাহিনী থেকে আমরা আরও জানতে পারি, রাজা লোমপাদ ব্রাহ্মণদের সাথে দুর্ব্যবহার করায় তাঁর রাজ্যে অনাবৃষ্টি দেখা দিলে রাজা বিধান পান তাঁর রাজ্যে ঋষ্যশৃঙ্গকে আনয়ন করতে হবে। লোমপাদ বিভান্ডকের আশ্রম থেকে ঋষ্যশৃঙ্গকে আনার জন্য বরাঙ্গনাকে পাঠান। বরাঙ্গনারা বিভান্ডকের অনুপস্থিতিতে ঋষ্যশৃঙ্গকে সহজেই নিয়ে আসে এবং তাঁদের অঙ্গদেশে অভিশাপ মুক্ত হয়ে বর্ষন হয়। অবশেষে লোমপাদের পালিত কন্যার সাথে ঋষ্যশৃঙ্গের বিবাহ হয় এবং রামায়নে সুপরিচিত হয়ে ওঠে।

শূর্পনখা (রামায়ন):-

রামায়নে রাবনের ভগিনী শূর্পনখা ছিলেন রাক্ষসকন্যা। এই চরিত্রটির মধ্যে প্রতিবন্ধকতা হিসেবে আমরা দেখতে পাই, চোখ ট্যারা, বাদামী চুল, কর্কশ কন্ঠস্বর, চাঁদের মতো নখ। এই চরিত্রটিকে বাল্মীকি রামায়নে খলচরিত্র হিসেবে তুলে ধরেছে। কাহিনী অনুসারে আমরা দেখতে পাই শূর্পনখা লক্ষণকে প্রনয় নিবেদন করতে গেলে লক্ষণ তাঁর নাসিকাচ্ছেদন করেছিল। তাঁর এই অবমাননার কথা তাঁর নিজের মুখে বলতে দেখা যায়, শূর্পনখা যুগযুগান্তরের নারীর অসহায়ত্বের মূর্তি। তাঁর মধ্যে নানান প্রতিবন্ধকতা থাকলেও তাঁকে রামায়নের একটি চরিত্র হিসেবে আমরা পেয়ে থাকি।

উপমন্যু (মহাভারত):-

গুরু আয়োদধৌম্যের অন্যতম শিষ্য ছিলেন উপমন্যু। গুরুগৃহে থাকাকালীন উপমন্যু গোরু চরাতে যেতেন। গুরুর দেওয়া সমস্ত পরীক্ষাতে তিনি উত্তীর্ন হয়েছিলেন। একদিন পিপাসায় তিনি ক্লান্ত

হয়ে আকন্দ পাতা খেয়ে ফেলেন তাঁর সাময়িক অন্ধত্ব ঘটে এবং দৃষ্টিহীন হয়ে একটি কূপে পড়ে যান। এদিকে সময় অতিক্রম হয়ে গেলেও শিষ্য উপমন্যু না ফেরায় গুরু তাঁর খোঁজে বেরোলেন। সেখানে গুরুর আওয়াজ শুনে কূপের ভেতর থেকে উপমন্যু তাঁর নিজের অবস্থান জানান। তখন গুরু তাঁকে উদ্ধার করেন। অশ্বিনীভ্রাতৃদ্বয়ের দেওয়া পিষ্টক খেয়ে উপমন্যু অন্ধত্ব থেকে মুক্ত হল। মহাভারতের কাহিনীতে উপমন্যুর প্রতিবন্ধকতা স্বরূপ এই চিত্রটি ফুটে উঠেছে।

জরাসন্ধ (মহাভারত):-

মহাভারতের একটি উল্লেখযোগ্য চরিত্র হল জরাসন্ধ। জরাসন্ধের পিতা বৃহদ্‌রথ ও মাতা কাশীরাজের দুই যমজ কন্যা। বৃহদ্রথ কাশীরাজের দুই জমজ কন্যাকে বিবাহ করেছিলেন কিন্তু বিবাহের বহুবছর পরেও তাদের কোনো সন্তান ছিল না। তারপর একদিন ঋষি চন্দ্রকৌশিক পুত্র সন্তানের জন্য রাজাকে একতি মন্ত্রপূত আম দেন, কিন্তু রাজা দুই রানীকে সমান ভালোবাসতেন, তাই তিনি আমটিকে সমান দুই ভাগে ভাগ করে রানীদের দেন। দুই রানীই অর্ধেক শিশু জন্ম দেয়। তখন রাজা রেগে গিয়ে অর্ধ শিশুদুটিকে বনে ফেলে আসেন। সেই বনে জরা নামে এক রাক্ষসী ছিলেন। সে ওই অর্ধ শিশুদুটিকে জোড়া লাগিয়ে রাজার কাছে দিয়ে আসেন। জরা নামক রাক্ষসীর দ্বারা শিশুদুটিকে জোড়া লাগানো হয়। তাই শিশুটির নাম হয় জরাসন্ধ। মহাভারতের কাহিনীতে, জরাসন্ধের জন্মের সময় প্রতিবন্ধকতা থাকলেও শেষ পর্যন্ত তাঁর পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়।

ধৃতরাষ্ট্র (মহাভারত):-

কুরুবংশের অন্যতম নৃপতি ছিলেন ধৃতরাষ্ট্র। অম্বিকার পুত্র ছিলেন ধৃতরাষ্ট্র। ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ ছিলেন। হিন্দুশাস্ত্র জন্মান্তরে বিশ্বাসী। প্রত্যেক মানুষকে তাঁর কৃতকর্মের ফলভোগ করতে হবে। একজন্মে না হলে তা জন্মান্তরে বাহিত হয়।

উপাখ্যান থেকে জানা যায়, ধৃতরাষ্ট্র তাঁর পূর্বজন্মে একজন ক্ষত্রিয় রাজা ছিলেন। তখন ক্ষত্রিয় রাজারা হরিন মাংস ভক্ষণ করত। তাই রাজা হরিন শিকারে বনে যায়, এক মায়াবী হরিন তাঁকে আকৃষ্ট করে গভীর জঙ্গলে নিয়ে যায়। সেখান থেকে রাজা রাজপ্রসাদে ফিরতে না পেরে এক গাছের নীচে আশ্রয় নেন। গাছের ডালপালা জ্বালিয়ে রাজা খাবারের কথা ভাবতে থাকেন। যে গাছের নীচে রাজা বসেছিলেন সেই গাছে পাখি দম্পতি তাদের একশো ছানা সহ বাস করত। রাজার ক্ষুধা নিবৃত্তি করার জন্য একে অন্যের শাবকদের প্রতি ভূমিকা নিয়ে তর্কাতর্কি করতে গিয়ে দুজনেই আগুনে ঝাঁপ দেয়। রাজা দুই

পাখির ঝলসানো মাংস ভক্ষণ করে। এরপর রাজার খাবার স্পৃহা আরও বেড়ে গেলে গাছের একশো ছানাকে পুড়িয়ে খেয়ে ফেলে। পূর্বজন্মের কৃতকর্মের জন্য ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ হন এবং যুদ্ধক্ষেত্রে শতপুত্রের মৃত্যুসংবাদ তাঁকে শুনতে হয়।

শিশুপাল (মহাভারত):-

মহাভারতের অন্যতম চরিত্র শিশুপালের জন্ম হয় তিনটি চক্ষু এবং চারটি হাত নিয়ে। পিতা দমোঘোষ এই বিকৃত অঙ্গ শিশু ত্যাগ করতে চাইলে দৈববানী হয় যে, যার অঙ্গের স্পর্শে শিশুর অতিরিক্ত অঙ্গ অবলুপ্ত হবে তার হাতেই শিশুপালের মৃত্যু হবে। শিশুপালের মাতার এক আত্মীয় কৃষ্ণের কোলে শিশুপালের অতিরিক্ত অঙ্গ খসে পড়ে। কথা অনুসারে কৃষ্ণ শিশুপালের একশত অপরাধ ক্ষমা করলেও শেষ অবধি কৃষ্ণের হাতেই মৃত্যু হয়। মহাভারতের এই শিশুপাল চরিত্রটিকে আমরা প্রতিবন্ধী হিসেবে তুলে ধরতে পারি।

উপরি উল্লেখিত পুরাণ, মহাভারত, রামায়নের এই চরিত্রগুলি ছাড়াও আরও অনেকগুলি প্রতিবন্ধী চরিত্র আমরা দেখতে পাই। পুরাণের ‘জড়ভরত’, রামায়নের ‘মন্থরা’, মহাভারতের ‘শকুনি’,’শিখন্ডী’, ছাড়াও আরও অনেক প্রতিবন্ধী চরিত্র রয়েছে। পুরাণ মহাকাব্যের এই বিশেষ সক্ষম বা অক্ষম মানুষগুলি সম্পর্কে অতিসংক্ষেপে উল্লেখ রয়েছে এই অধ্যায়ে। অতি অল্প পরিসরে প্রতিবন্ধকতা অতিক্রমকারী চরিত্রগুলিকে ফুটিয়ে তুলেছি এখানে। প্রতিবন্ধকতা দমিয়ে রাখতে পারেনি তাঁদের জীবনের চলার পথে। নতুনভাবে সব বাধা পেরিয়ে এসেছেন এঁরা। এই প্রতিবন্ধী চরিত্রগুলির সামাজিক অবস্থান এই অধ্যায়ে তুলে ধরেছি।

তৃতীয় অধ্যায়

বাংলা শিশু কিশোর সাহিত্যে প্রতিবন্ধী চরিত্র

একটি বিশেষ শ্রেণীর সাহিত্য সম্ভারকে শিশুসাহিত্য অথবা কিশোর সাহিত্য রূপে পৃথকীকরণের মূল উদ্দেশ্য পাঠক শ্রেণীর চিহ্নিতকরণ। শিশু ও কিশোর পাঠকের কথা ভেবেই শিশু ও কিশোর সাহিত্যের সূচনা ঘটেছে। সাধারণভাবে বয়স্ক পরিণত মনের অধিকারী পাঠকের জন্য রচিত সাহিত্যকে বয়স্কসাহিত্য বলা হয় না। সাহিত্যের আগে 'শিশু' কিংবা 'কিশোর' শব্দগুলি বসিয়ে 'শিশু ও কিশোর' মনের উপযোগী সাহিত্যকে চিহ্নিত করা হয়। সুতরাং 'শিশু সাহিত্য' বা 'কিশোর সাহিত্য' নির্দিষ্ট বয়সের পাঠকের কথা মনে করেই লেখা। 'শিশু' ও 'কিশোর' পরিভাষা দুটি নির্দিষ্ট বয়সকেন্দ্রিক। শিশু সাহিত্য বলতে মূলতঃ শিশুদের উপযোগী সাহিত্য, সাধারণত ৬-১০ বছর বয়সী শিশুদের মনস্তত্ত্ব বিবেচনায় রেখে রচিত শিক্ষামূলক অথচ মনোরঞ্জক গল্প, ছড়া, কবিতা, উপন্যাস ইত্যাদিকেই সাধারনভাবে শিশুসাহিত্য বলে। শিশুসাহিত্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য এর বিশেষ বক্তব্য, ভাষাগত সারল্য ও বর্ণের সমাবেশ। শিশু সাহিত্যের বিষয়বৈচিত্র অফুরন্ত। এতে থাকে রূপকথা, রাজকন্যা-রাজপুত্রের গল্প, কিশোর সাহিত্য শিশু সাহিত্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত হলেও আরেকটু বৈচিত্র্যময় সাহিত্য। প্রথমদিকে মূলতঃ বিনোদনের উদ্দেশ্যে শিশুসাহিত্যের সূচনা হলেও পরবর্তীকালে এর সঙ্গে প্রশিক্ষণ এবং নীতিশিক্ষা যুক্ত হয়। কিশোর বয়স যেমন একইসঙ্গে শৈশব ও যৌবনের সঙ্গে জড়িত। কিশোর সাহিত্যেও তেমনি রূপকথা, নীতিশিক্ষার সঙ্গে আসে অ্যাডভেঞ্চার-এর প্রতি বিশেষ আকর্ষণ। শিশু-কিশোর উভয় সাহিত্যেই মূলতঃ যে কটি বিষয় থাকে, বা বলা যায় শিশু-কিশোর সাহিত্যের পাঠকদের পছন্দের বিষয়গুলির মধ্যে থাকে রূপকথার গল্প, নীতিরকথামূলক গল্প, হাসির গল্প, গোয়েন্দা গল্প, ভৌতিক গল্প, কল্পবিজ্ঞানের গল্প, উদ্ভট গল্প প্রভৃতি।

বাংলা শিশু সাহিত্যের সার্থক সূচনা দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের 'ঠাকুরমার ঝুলি' থেকেই হয়েছিল। শিশু সাহিত্যে অসামান্য অবদান রেখে গিয়েছিলেন উপেন্দ্রকিশোর এবং সুকুমার রায়। ছোটদের জন্য 'রামায়ণ ও মহাভারত' তিনিই প্রথম প্রকাশ করেন। তার সঙ্গে 'টুনটুনির বই', 'আকাশের কথা', 'বেচারাম ও কেনারাম', 'গুপী গাইন বাঘা বাইন'- একের পর এক শিশু সাহিত্য তাঁর কলমে আর ছবিতে সেজে উঠেছিল। আবার চিত্রশিল্পী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'খাজাঞ্জির খাতা' ও 'বাদশাহী গল্পে' উদ্ভব কল্পনার জাল বিস্তার করে। 'রাজকাহিনী'তে কিশোর মনের কল্পনা বিলাস পুরণ করেন।

এই সাহিত্যধারায় আধুনিককালের লেখকদের মধ্যে প্রেমেন্দ্র মিত্র, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, লীলা মজুমদার, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় রয়েছেন।

শিশু-কিশোর সাহিত্যে বিভিন্ন সাহিত্যিকরা তাদের রচনায় রূপকথা অলৌকিক ভৌতিক চরিত্রের পাশাপাশি প্রতিবন্ধী চরিত্রদেরও স্থান দিয়েছেন। যেমন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ক্ষীরের পুতুল'(১৮৯৬) গল্পে দুঃখী দুওরানীর দাসীটি বোবা কালা। এর মধ্য দিয়ে শিশুরা বুঝল শারীরিক প্রতিবন্ধকতা এবং দুঃখ-কষ্ট পরস্পরের সঙ্গী-সাথী।

কালের অগ্রগতিতে সাহিত্যের ক্রম-পরম্পরায় লীলা মজুমদারের সাহিত্যে প্রতিবন্ধকতা পেরিয়ে যাবার ক্ষেত্রে মানুষ এবং সমাজের পরিবর্তন ইতিবাচকতার স্বাক্ষরবাহি। আমরা এখানে লীলা মজুমদারের কিছু কিছু গল্পের প্রতিবন্ধী চরিত্রগুলি তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

পানু: নেপোর বই: লীলা মজুমদার

লীলা মজুমদারের আরেক চরিত্র পানু, 'নেপোর বই'(১৯৬৯) উপন্যাসের নায়ক সে। গাছ থেকে পড়ে গিয়ে শিরদাঁড়ায় আঘাত পাওয়ার জন্য তার হাঁটা চলার সমস্যা হয়। সাত মাস ধরে সে হাঁটতে পারছে না। যদিও ডাক্তার বলেছে এটা তার মনের রোগ। পানু নাকি ইচ্ছে করলেই আবার হাঁটতে পারবে। আমরাও জানি ইচ্ছা থাকলেই উপায় হয়। হঠাৎ একদিন পানুর সামনে তার বন্ধুরা অসুস্থ হয়ে জ্ঞান হারালে পানু তাদের সুস্থ করার জন্য তাড়াতাড়ি কুঁজো পেড়ে জল দিতে গিয়ে দেখল, সে দিব্যি চলতে পারছে। আসলে কোনো জিনিসকে আঁকড়ে ধরে নিয়ে বসে থাকলে আমরা যেমন সেইখান থেকে বেরোতে পারি না ঠিক তেমনি পানুও তার এই প্রতিবন্ধকতাকে নিয়ে বসেছিল তাই সেও কোনো দিন ভাবতেই পারেনি যে সেও আরও পাঁচজনের মতো চলতে পারবে। পানুর এই সাময়িক চলন শক্তিহীনতাকে লীলা মজুমদার সাময়িক সমস্যা রূপেই দেখাতে চেয়েছেন। আসলে এই উপন্যাসের মধ্য দিয়ে তিনি শিশুদের কাছে এই বার্তাই দিয়ে গেছেন যে, মনের জোরে যে কোনো সমস্যা থেকে উত্তরণ করা সম্ভব।

পুঁটি: কাঠের ঘোড়া: লীলা মজুমদার

লীলা মজুমদারের 'কাঠের ঘোড়া' গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র পুঁটি। রিকশা থেকে পড়ে গিয়ে হাঁটুতে আঘাত লাগার কারণে তার একটা পা ছোটো হয়ে যায়। আসলে এটি তার জন্মগত প্রতিবন্ধকতা নয়। রাস্তায় চলার সময় তাকে দেখে সবাই হাসাহাসি করে। সেই কারণেই পুঁটি দাদু দিদার কাছেই থাকে। পুঁটি সারাদিন খাটে শুয়ে থাকে তার নিজের প্রতিবন্ধকতার জন্য কান্নাকাটি করে। যে খাটে সারাদিন পুঁটি শুয়ে থাকে তার চারটে পায়ার মধ্যে একটা ঘোড়ার আকৃতির আর বাকিগুলো সাধারণ আকৃতির।

এই ঘোড়ার আকৃতির পায়াটা রোজই পুঁটির কাছে বলতে থাকে পুঁটি যেন ঐ বাকি তিনটে পায়াকেও ঘোড়া করে দেয়। কিন্তু পুঁটি নিজের দুঃখের জগতে এতটাই নিমগ্ন থাকে যে সেই পায়ার কথা ভাবতেই ভুলে যায়। তারপর হঠাৎ-ই একদিন পুঁটি কাঁদতে কাঁদতে আধো ঘুমো ঘুমো অবস্থায় দেখে ভোর হয়ে গেছে। তখন পুঁটি উঠে এসে দেখে, খাটের পায়াগুলোর কাছে ছুতোরের যন্ত্রপাতি পড়ে আছে। তা দেখে পুঁটি খাটের ওই বাকি তিনটে পায়াতেও ঘোড়া খোদাই করার কাজ শুরু করে দেয়। ওই কাজ করার সময় ঐ নির্মীয়মান ঘোড়াগুলো নানারকম নির্দেশ দিতে থাকে এবং সেই নির্দেশ অমান্য করলেই ঘোড়াগুলো পুঁটির আহত হাঁটুতে লাথি মারতে থাকে। গল্প শেষে দেখা যায়, ঘোড়া তিনটি নির্মাণও শেষ হয় এবং পুঁটিও সুস্থ হয়ে ওঠে। খাটের চারটে পায়া সমান হলে পুঁটিরও পা দুটি সমান হয়ে যায়। আসলে লীলা মজুমদার এই গল্পের মধ্য দিয়ে শিশু পাঠকদের কাছে এই বার্তাই দিয়ে গেছেন যে, নিজের প্রতিবন্ধকতাকে নিয়ে বসে না থেকে গঠনাত্মক কাজ করলে জীবনের সব প্রতিবন্ধকতা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

কুমু: পাখি: লীলা মজুমদার

লীলা মজুমদার 'পাখি' ছোটগল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র কুমু। এই ছোট্ট মেয়েটিকেও প্রতিবন্ধকতা রেহাই দেয়নি। কঠিন অসুখের জন্য সে তার ডান পা এক বিঘত এর বেশি তুলতে পারেনা। তার বাবা-মা তাকে মামার বাড়িতে দিদার কাছে রেখে আসে। সেই বাড়িতে থাকা একটি ছেলে তাকে ল্যাংড়া বলে খেপায়। তাই সারাদিন দোতলার ঘরের মধ্যে শুয়ে শুয়ে নিজের অক্ষমতার কথা ভেবে মন খারাপ করত। একদিন হঠাৎ দোতলা ঘরের জানালা দিয়ে কুমু এক ঝাঁক বুনো হাঁসকে উড়তে দেখে। ওই বুনোহাঁসের দলের একটি হাঁস পাখনায় আঘাত লেগে কুমুর বাড়ির সামনের একটি গাছের ডালে আটকে পড়ে। কুমু তাকে একটি বাঁসা বানিয়ে দেয়। এর ফলে পাখিটি আস্তে আস্তে নিজে পোকা-মাকড় খেয়ে সুস্থ হয়ে উড়ে যায়। কুমু দোতলার ঘরে বসে বসে পাখিটির জীবনের লড়াইয়ে হেরে না গিয়ে সংগ্রাম করে ঘুরে দাঁড়ানো দেখে। তখন কুমু উপলব্ধি করে পাখিটির একটি ডানা ছোটো হওয়া সত্বেও যখন আবার জীবনের স্বাভাবিক স্রোতে ফিরতে পেরেছে তাহলে কুমু পারবে না কেন? আসলে লীলা মজুমদার এই ছোটোগল্পে শিশুপাঠকদের এটাই বুঝাতে চেয়েছেন জীবন মানেই ভালো মন্দ। তাই থেমে থাকলে চলবে না। আজ মন্দ আছে মানে কাল ভালো আসবেই। তাই শেষ পর্যন্ত কুমুও তার প্রতিবন্ধকতাকে জয় করতে পেরেছিল।

তানি: তানির ডায়েরী: লীলা মজুমদার

‘তানির ডায়েরী’ গল্পে লীলা মজুমদার তানির প্রতিবন্ধকতার চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন। তানি ছিল গমন সংক্রান্ত প্রতিবন্ধী। তার পায়ের সবকটা আঙ্গুল তলার দিকে দুমড়ানো। তাই সে গোঁড়ালিতে ভর দিয়ে হাঁটাচলা করে। সবাই তাইজন্য তাকে ল্যাংড়া বলে। এমনকি তার ছোটো ভাই পুন্যও তাকে দাদা না বলে ল্যাংড়াই বলে। বাড়িতে কেউ তাকে ভালোবাসতো না। তাই মনের দুঃখে তানি একদিন জঙ্গলে চলে যায়। সেখানে দূর থেকে দেখে এক বিরাট কালো জন্তু, যাকে তানি কালো বিড়াল ভাবলেও সেটা ছিল আসলে একটা মস্ত চিতাবাঘ। সেই জন্তুটা বাচ্চাদের দুধ খাওয়াচ্ছিল, এদের মধ্যে একটা বাচ্চাকে সবাই দূরে সরিয়ে দিচ্ছিল। এমনকি মা-ও তাকে দেখছিল না। কারণ বাচ্চাটা খারাপ দেখতে, রোঁয়া ওঠা। তাকে কেউ আপন বলে মনে করে না। এই চিতা বাচ্চাটির সাথে তানি একাত্ম অনুভব করে। কারণ তানির পরিবারেও তার এই প্রতিবন্ধকতার জন্য তাকে ভালো চোখে দেখত না। তাই তানি বাচ্চাটিকে উদ্ধার করে নিজের ফতুয়ার মধ্যে ঢুকিয়ে নিয়ে চলে যায়। সেখানে এক সাহেব বাচ্চাটিকে শিকার করার জন্য ছিল। তিনি সমস্ত কিছু দেখে তানির সাহসিকতার পরিচয় পেলেন। তাই উপকার করার জন্য তানিকে হাসপাতালে নিয়ে গেলেন এবং তাকে সুস্থ করে তুললেন। এই গল্পের মধ্য দিয়ে লীলা মজুমদার দেখালেন, শুধু নিজের দুঃখ নিয়ে থেমে থাকলেই চলেনা। কারণ পৃথিবীতে আরো অনেক বেশী পরিমাণে দুঃখী রয়েছে। তাই নিজের দুঃখ ভুলে যদি অপরের দুঃখে সাহায্য করা যায় তাহলে নিজের দুঃখ থেকে সহজেই পরিত্রাণ পাওয়া যায়।

লীলা মজুমদার শিশু-কিশোর সাহিত্যের মধ্যে অন্যতম। তিনি তার প্রতিটি লেখায় পাঠককে কোনো না কোনো বার্তা দিয়ে গেছেন। আসলে শিশু-কিশোর হল আমাদের সমাজের ভবিষ্যৎ। তাই তাদের সামনে যেমন কঠোর বাস্তবকে তুলে ধরেছেন আবার সাথে সাথে শিক্ষামূলক বার্তাও দিয়ে গেছেন। এই অধ্যায়ে আলোচ্য লীলা মজুমদারের গল্পগুলিতে তিনি প্রত্যেকটি প্রতিবন্ধী চরিত্রগুলির প্রতিবন্ধকতা জয়ের মধ্য দিয়ে এক শিক্ষামূলক বার্তা দিয়েছেন শিশু-পাঠক মনে।

চতুর্থ অধ্যায়

নির্বাচিত বাংলা কথা সাহিত্যে চরিত্র কেন্দ্রিক প্রতিবন্ধী চরিত্র

"একটা সুন্দর বাড়ি তৈরি করা ততোটা কঠিন কাজ নয়, যতোটা কঠিন কাজ একটা সুন্দর চরিত্র তৈরি করা"

আমাদের মনে স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন জাগে চরিত্র আসলে কি? আসলে চরিত্র হল বাস্তবের মানুষগুলির লেখক কর্তৃক বিশ্লেষণ, Harry Shaw তাঁর বিখ্যাত 'Dictionary of Literary Terms' পুস্তকে চরিত্র বা Character সম্পর্কে বলেছেন 'চরিত্র হলো কোন ব্যক্তি বা জীবের আকৃতিগত ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের সমন্বয়, যা তার সামগ্রিক রূপকে প্রকাশ করে'। আবার স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন- 'চরিত্র কতগুলি মানসবৃত্তি ও অভ্যাসের সমন্বয়'। অবশেষে আমরা বলতে পারি, চরিত্র হলো জীবন তরীর হাল। সংসার সমুদ্রে বহমান জীবনতরী, আর এই তরীর হাল হল মানব চরিত্র।

বিভিন্ন কবি সাহিত্যিক তাদের রচনাগুলিকে আরো আকর্ষণীয় করে তোলে এই চরিত্রের মাধ্যমে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'সাহিত্যের তাৎপর্য' প্রবন্ধে বলেছেন 'মানুষের চরিত্রও এমন একটা সৃষ্টি যাহা জড়সৃষ্টির ন্যায় আমাদের ইন্দ্রিয়ের রূপ আয়ত্বগম্য নয়, কারণ মানব চরিত্র ধরা বাঁধার অতীত, তার লীলা এত বিচিত্র ও সূক্ষ্ম যে একমাত্র ব্যাসদেব, বাল্মিকী, কালিদাস প্রমুখ মহান কবির পক্ষেই এ কাজ সম্ভবায়িত হয়েছে।

বাংলা সাহিত্যের জগতে যদিও কথাসাহিত্য নবীনতম সদস্য তবুও এর পরিসর মোটেই কম নয়। বহুবিধ চরিত্র সমৃদ্ধ করেছে কথাসাহিত্য ভান্ডারকে। এখানে নায়ক-নায়িকা চরিত্রগুলি সক্ষম সরল সুন্দর। আমরা চিরকাল দেখেছি নায়ক চরিত্ররা যেমন বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা পেরিয়ে জয়লাভ করে আবার তেমনি নায়িকা চরিত্রগুলিও নিজেদেরকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে নানা প্রতিবন্ধকতার সাথে লড়াই করে। এদের এই জয়লাভের পথ মসৃণ নয়। আমরা বাংলা কথাসাহিত্যের আঙিনা থেকে এরকম বেশ কিছু চরিত্র নিয়ে আলোচনা করেছি।

দৃষ্টি সংক্রান্ত প্রতিবন্ধী

বাংলা কথাসাহিত্যে দৃষ্টি সংক্রান্ত প্রতিবন্ধকতার শিকার চরিত্রের সংখ্যা কম নয়। এখান থেকে আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের 'রজনী (১৮৭৫)' উপন্যাসের 'রজনী' চরিত্রটির সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছি।

রজনী: 'রজনী' (১৮৫৭): বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

'রজনী' সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের একটি ব্যতিক্রমধর্মী উপন্যাস। কথাসাহিত্যে প্রথম প্রতিবন্ধী চরিত্র হলো রজনী। বঙ্কিমচন্দ্র রচিত উপন্যাসগুলির প্রধান বৈশিষ্ট্য রোমান্সধর্মীতা এবং পরিবেশনায়। কাহিনীর ঘটনা সন্নিবেশে ও চরিত্র সৃষ্টিতে তিনি সর্বত্র বিস্ময়ের সঞ্চার করেছেন। নরনারীর জীবনে প্রেম আসাটা স্বাভাবিক কিন্তু জন্মান্ধ নারী ভালবাসতে পারে কিনা, প্রেমানুরাগ তার হৃদয়দেশে কতখানি সক্রিয়, কোন পথে তার প্রণয়ানুভূতির উন্মীলন, অন্ধনারীর এই প্রেমোন্মাদের চিত্র অঙ্কন করেছেন 'রজনী' উপন্যাসে।

১৮৩৪ সালের লর্ড লিটনের 'The Last Days of Pompeii' উপন্যাসের নায়িকা চরিত্র নিদিয়ার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে বঙ্কিমচন্দ্র 'রজনী' চরিত্রটি চিত্রাঙ্কন করেছেন। যদিও লিটনের উপন্যাসে অন্ধের পর্যবেক্ষণ শক্তির বৈশিষ্ট্য দেখানো হয়েছে, কিন্তু সেই বৈশিষ্ট্য কিভাবে তার হৃদয়ের অনুভূতিকে রূপান্তরিত করে তার বর্ণনা নেই। 'রজনী' উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র জন্মান্ধ রজনীর প্রেম ভালবাসার বিভিন্ন অনুভূতিকেই লেখার মাধুর্যবলে আত্মকাহিনীর কথনরীতি মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন।

উপন্যাসের শুরুতেই রজনী নিজেই তার প্রতিবন্ধকতার কথা শিকার করেছেন,

'আমি জন্মান্ধ।'

হরেকৃষ্ণ দাসের একমাত্র কন্যা রজনী। গৃহিণীর মৃত্যুর পর রুগ্ন হরেকৃষ্ণ রজনীর দেখভালের জন্য তাকে কলকাতায় আপন শ্যালিকার পতি রাজচন্দ্র দাসের কাছে পাঠিয়ে দেন। নিঃসন্তান রাজচন্দ্র দম্পতি দরিদ্রতা সত্ত্বেও অন্ধবালিকার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। সামান্য ফুল বিক্রি করে তাদের সংসার অতিবাহিত হচ্ছিল। রাজচন্দ্র ফুল এনে দিলে রজনী মালা গেঁথে দিতো আর তা বিক্রি করেই তাদের সংসার চলত। তারা কোনদিন রজনীকে জানতে দেয়নি যে সে তাদের নিজের সন্তান নয়।

অন্ধ হলেও রজনী ছিল পরমসুন্দরী। স্থির প্রকৃতি সুন্দর শরীরে সেই কটাক্ষ হীন দৃষ্টি দেখিয়ে কোনো ভাস্কর্য্যপটু শিল্পকারের যত্ননির্মিত প্রস্তরময়ী স্ত্রীমূর্তি বলিয়া বোধ হইত। কিন্তু ভাগ্যের পরিহাসে অন্ধত্বের কারণে সে তার নিজের রূপটাও দেখতে পায় না। জন্মান্ধ রজনীর জগৎ ছিল খুবই সীমাবদ্ধ। তার অন্ধকার জগতে শুধুই শব্দের ছড়াছড়ি। তার অন্ধকার জগৎ শব্দ, স্পর্শ, গন্ধময়। তার অন্ধত্ব যে কতটা দুর্বিষহ তা দৃষ্টিজাত লোকেরা বুঝতে পারেনা। যা রজনীর জবানীতে পাই- **"কি প্রকারে বুঝবে? তোমাদের জীবন দৃষ্টিময়, আমার জীবন অন্ধকার-দুঃখ এই আমি ইহা অন্ধকার বলিয়া জানি না, আমার এ রুদ্ধ নয়নে তাই আলো! না জানি তোমাদের আলো কেমন!"**

দরিদ্রতা কখনো স্বভাব পরিবর্তন করতে পারে না, দরিদ্র রজনীর স্বভাবের স্নিগ্ধতায় লেখক এতটাই মুগ্ধ হয়েছিলেন যে রাগের মুহূর্তেও রজনীর মুখ দিয়ে কোনো খারাপ কথা প্রকাশ করাতেই পারল না। আসলে এটা তার পরিবারের সংস্কৃতিরই পরিচয়। গরীব হতে পারে কিন্তু তাদের সংস্কৃতি ছিল উচ্চমানের। রজনীর এই সংস্কৃতির পরিচয় পেয়েছিলেন ছোটোবাবু। তাই তিনি বলেছেন- **"এটি তো ভদ্রলোকের মেয়ে মতই বোধ হইতেছে"।**

সংসার ধর্ম বড় ধর্ম। সব মানুষকেই এই ধর্ম পালন করতে হয়। তাই রজনী-ই বাদ যাবে কেন? কিন্তু অন্ধ মেয়েকে বিয়ে করবে কে? এই বিবাহ রজনীর সমান্তরাল দুটি মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে। একবার সে বলেছে তার যে বিয়ে হয়নি তাতে নাকি ভালোই হয়েছে। বিবাহিতা রমণীর চেয়ে কানা ফুলওয়ালিই ভালো। আবার অনেক দৃষ্টিজাত রমণী আছে যারা পুরুষ মনে প্রবেশ করতে পারেনি, এটা রজনীর জবানীতে-

"কানা বলিয়া আমার বিবাহ হইল না, সেটা দুর্ভাগ্য কি সৌভাগ্য, যে চোখের মাথা না খাইয়াছে, সেই বুঝবে। অনেক অপাঙ্গরঙ্গিনী, আমার চিরকৌমার্যের কথা শুনিয়া বলিয়া গিয়াছে, আহা আমিও যদি কানা হইতাম"।

অন্ধত্ব কখনো ভালোবাসার অনুভূতি কেড়ে নিতে পারে না। অন্ধ মানুষরাও ভালোবাসতে চায়, কাউকে আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চায়, রজনীও তাই চায়। তাই মাত্র সতেরো বছর বয়সে বাবার কাছে গল্প শুনে মনুমেন্টকে স্বামী হিসেবে কল্পনা করে নেয় আর চার বছরের বালক বামাচরণকে নিজের স্বামী বলে পরিচয় দেয়। এই দুটি বক্তব্যের মধ্য দিয়ে রজনীর চরিত্রে রসিকতাবোধ, বিবাহ সম্পর্কে তার আগ্রহ ও বিবাহ না হওয়ার জন্য মানসিক যন্ত্রণার প্রকাশ পেয়েছে। শুধু গলার আওয়াজ শুনেই বড়ো বাড়ির ছোটো ছেলে শচীন্দ্রকে মনে মনে ভালোবেসে ফেলে। অন্ধ মেয়ে বাবা-মা সংসারের সবার কাছে বড়ো দায়। তাকে বিদায় করতে পারলেই যেন সবাই দায় মুক্ত হয়। কিন্তু রজনী নিজেকে সংসারের দায় বলে মনে করে না। অন্যান্য প্রতিবন্ধীদের মতো সে নিজেকে কখনো দুর্বল ভাবে না। অন্ধ হলেও তার নিজস্ব একটা ব্যক্তিত্ব আছে, রুচি আছে, আর এই রুচি ও আদর্শের জন্যই গোপাল বা হীরালালকে সে কখনোই শিকার করেনা। পরিস্থিতির চাপে মনের জোর হারলেও শরীরের জোরের পরিচয় সে হীরালালকে দিয়েছে। রজনী শচীন্দ্রকে ভালবাসলেও শচীন্দ্র দরিদ্র রজনীকে স্ত্রী হিসাবে ভাবতেও পারে না। কিন্তু রজনীর সম্পত্তি প্রাপ্ত হওয়ার পর তার আসল পরিচয় জানার পর আস্তে আস্তে শচীন্দ্রের মনে রজনীর প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ পায়।

অমরনাথ ছিল রজনীর কাছে জীবনত্রাতা-জীবনদাতা। তাই অমরনাথের উপস্থিতিতে শচীন্দ্র ও রজনীর বিবাহের প্রস্তাব এলে রজনীর মনে যতই শচীন্দ্রের প্রতি একনিষ্ঠ ভালোবাসা থাকুক না কেন

অমরনাথের অভিভাবকত্ব ভেঙে বেরয়নি। রজনীর মনের কৃতজ্ঞতাবোধ অন্ধপ্রেম আচ্ছন্ন করতে পারেনি।

বঙ্কিমচন্দ্র চিরকালই নীতিবাগীশ। কর্মফলববাদ, নিয়তিবাদ প্রায় সব রচনাতেই থাকে বঙ্কিমচন্দ্রের, এই নিয়তি-ই রজনীকে নতুন জীবন দান করেছিল, শেষ পর্যন্ত সে তার এই প্রতিবন্ধকতাকে কাটিয়ে উঠতে পেরেছিল যা শচীন্দ্রের জবানীতে পাই- **"ঔষধ দিয়া তিনি এক মাসে রজনীর চোখের দৃষ্টি সৃজন করিলেন"।** আসলে নিষ্কাম কর্ম এবং তার সুফল লাভের আদর্শ প্রতীক হয়ে উঠেছে রজনী।

বাক প্রতিবন্ধী

বাকপ্রতিবন্ধীদের সাধারণত মূক বলা হয়। মূক ও বধির পরস্পর সম্পর্কযুক্ত হলেও অনেকক্ষেত্রে এর অন্যথাও দেখা যায়। অর্থাৎ কথাসাহিত্যে এমন অনেক চরিত্র আছে যারা কানে শুনতে পায় অথচ বলতে পারে না। আবার অনেক চরিত্র এমনও আছে যারা কথা বলতে পারে অথচ শুনতে পায় না। কথা সাহিত্যের বিপুল আঙিনায় এরকম প্রতিবন্ধী চরিত্রগুলির মধ্য থেকে আমরা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সুভা'(১২৯৯ বঙ্গাব্দ) গল্পের 'সুভা' চরিত্রটির জীবনে প্রতিবন্ধকতা সম্পর্কে আলোচনা করছি।

সুভা: 'সুভা' (১২৯৯ বঙ্গাব্দ): রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সুভা গল্পটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিখ্যাত "গল্পগুচ্ছ" থেকে নেওয়া হয়েছে। বাক প্রতিবন্ধী কিশোরী লেখকের হৃদয় নিংড়ানো ভালোবাসা ও মমত্ববোধ গল্পটি অমর হয়ে আছে। গল্পে সুভা কথা বলতে পারতো না। তার মা মনে করতেন ও তার নিয়তির দোষ। কিন্তু বাবা তাকে ভালোবাসতেন, আর কেউ তার সাথে মিশে না, খেলে না, কথা বলে না।

কিন্তু তার বিশাল এক আশ্রয়ের জগৎ আছে। যারা কথা বলতে পারে না সেই পোষা প্রানীদের কাছে সে মুখর, তাদের সে খুব কাছের মানুষ, আর বিপুল নির্বাক প্রকৃতির কাছে এসে প্রায় মুক্তির আনন্দ।

"সুভাষিনী বাকহীন হলেও চোখের জলের মাধ্যমে অনেক কথা বলে, কিন্তু সে কথা কেউ বুঝতে না পারায়, তার কপালে ছিল শুধু অপমান"।

বাক প্রতিবন্ধী সুভা তার পরিবার ও সমাজ থেকে যে আচরণ পেয়েছে তার বিবরণ-

আমাদের দেশে প্রতিবন্ধীরা কোনো না কোনো ভাবে পরিবারের অবহেলার শিকার। তবে কোনো পরিবারে বেশি, কোনো পরিবারে কম। অবহেলার কারণে প্রতিবন্ধীতা মেনে নিয়ে তারা

অবহেলিত, বঞ্চিত জীবন যাপনে বাধ্য হয়। অনেক সময় তাদের অনাহারে অর্ধাহারে থেকে দিন পার করতে হয়। অধিকাংশ পরিবারেই প্রতিবন্ধীদের বোঝা হিসেবে গণ্য করা হয়।

সুভা একজন বাকপ্রতিবন্ধী ছিল। বাকপ্রতিবন্ধী এই মেয়েকে নিজের মা পরিবারের বোঝা মনে করতেন। তার মা তাকে নিজের একটি ত্রুটি স্বরূপ দেখতেন। কন্যার এই অসমপূর্নতা লজ্জার কারণ বলে মনে করতেন এবং তার প্রতি বিরক্ত হতেন। পক্ষান্তরে, সুভার বাবা বাণীকণ্ঠ সুভাকে অন্য মেয়েদের তুলনায় একটু বেশি ভালোবাসতেন।

সুভা বাকপ্রতিবন্ধী হওয়ার কারণে তার কোনো বন্ধুবান্ধব ছিল না, সুভার গ্রামের লোকজন তাকে নিন্দা করতে শুরু করেছে। সুভার কথা ছিল না, কিন্তু তাহার সুদীর্ঘপল্লববিশিষ্ট বড়ো বড়ো দুটি কালো চোখ ছিল।

“সুভার দৃষ্টি না থাকলেও দৃষ্টির গভীরতা স্পর্শ করা যায়”।

মুখের ভাব আজন্মকাল যার অন্য ভাষা নেই, কিন্তু তার চোখের ভাষা অসীম উদার এবং অতলস্পর্শ। গভীর অনেকটা স্বচ্ছ আকাশের মতো। উদয়াস্ত এবং ছায়ালোকের নিস্তর রঙ্গভূমি। এই বাকহীন মনুষ্যের মধ্যে বৃহৎ প্রকৃতির মতো একটা বিজন মহত্ত্য আছে। এই কারণে সাধারণ বালিকারা তাকে একপ্রকার ভয় করত, তার সাথে কেউ খেলা করত না। সে নির্জন দ্বিপ্রহরের মতো শব্দহীন ও সঙ্গীহীন।

ভাষাহীন প্রকৃতিদুহিতার ভাষার অভাব পূরণ করে দিত প্রকৃতিমাতা। সুভার কণ্ঠে বাণী নেই, বানী নেই মনুষ্যচরাচরের জন্য। কিন্তু প্রকৃতির অন্যান্য অবলা প্রাণী যাদের মুখেও ভাষা নেই তাদের মধ্যে তো সংযোগসাধনের কোন অভাব নেই। প্রকৃতির এইসব নির্ভাষ প্রাণীগুলির সঙ্গে ভারী ভাব সুভার। সুভার সমবয়সী পল্লীমানুষরা সুভার বন্ধুত্ব স্বীকার না করলেও সুভার সুহৃৎ ছিল তাদের গোয়ালের দুটি গাভী সবর্শী ও পাঙ্গুলী, ছাগল ও বিড়ালছানা। লক্ষ্য করার বিষয় হল পশুগুলি সবই গৃহপালিত এবং অত্যন্ত আদর প্রিয়। পাশাপাশি মাতৃহীন বলাই মায়ের স্নেহ সান্নিধ্য উপলব্ধি করার চেষ্টায় প্রকৃতির বুকে লগ্ন হয়েছে। বাড়ির সামনে থাকা ঘন সবুজ ঘাসের ঢাল তার কাছে একান্ত নিজস্ব-

“প্রায়ই তারই সেই ঢাল বেয়েও নিজেও গড়াত সমস্ত দেহ দিয়ে খাড়া হয়ে উঠতো, গড়াতে গড়াতে ঘাসের আগায় ওর ঘাড়ের কাছে সুড়সুড়ি লাগত ও খিল খিল করে হেসে উঠতো”।

সুভা মানবী হয়েও প্রকৃতির অন্তর্গত। সুভার চোখের ভাষা “অসীম উদার এবং অতলস্পর্শীয় গভীর”। সাহিত্য সমাজকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়। সুভা গল্পেও এর ব্যতিক্রম হয়নি। গল্পের একটি সামাজিক দিক হয়তো উপেক্ষা করার মত ছিল না। সুভার বয়স হয়েছে, অতএব তার বিয়ের ব্যবস্থা

তার বাবা মাকে করতেই হবে নইলে সমাজে থাকা যাবে না। সুভা প্রকৃতির সন্তান তাই মানুষের নির্মমতার কবল থেকে উদ্ধার কামনা করেছে প্রকৃতির কাছেই। তাই যখন সে বিয়ের কথা জানতে পেরেছে সে প্রকৃতির কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করেছে-

"সুভা শয়নগৃহ হইতে বাহির হইয়া তাহার সেই চিরপরিচিত নদীতটে লুটাইয়া পড়িল যেন ধরণীকে, এই প্রকাণ্ড মূক মানবতাকে দুই বাহুতে ধরিয়া বলিতে চাহে। তুমি আমাকে যাইতে দিও না মা, আমার মতো দুটি বাহু বাড়াইয়া তুমিও আমাকে ধরিয়া রাখো"।

প্রতিবন্ধীরা আমাদের সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ তাদেরকে অবহেলায় পিছনে ফেলে রেখে সমাজ এগিয়ে যাবে তা কখনোই সম্ভব নয়। সুভা বাকপ্রতিবন্ধী হওয়ায় প্রথমত তার পরিবারকে তার পাশে দাঁড়াতে হতো। তার মনোবল বৃদ্ধির জন্য তার মায়ের মানসিকতায় পরিবর্তন আনা উচিত ছিল। তিনি সুভার যত্ন নিতে পারতেন, ভালোবেসে আগলে রাখতে পারতেন, তাছাড়া সুভার সমাজের অন্যান্য মানুষ সুভার প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি রাখতে পারতেন, তারা তাদের সন্তানদের উদ্বুদ্ধ করতে পারতেন সুভাকে বন্ধু হিসেবে গণ্য করার জন্য সুভা বাকপ্রতিবন্ধী হওয়া সত্ত্বেও সে চাইত তার বন্ধু-বান্ধব থাকুক, যাদের সাথে ইশারায় গল্প করবে, মনের ভাব প্রকাশ করবে। সে চেয়েছিল তার মা তাকে বোঝা না ভেবে ভালোবেসে কাছে টেনে নিক। কিন্তু তার কপালে যখন এসব জুটলো না, তখন সখ্যতা গড়ে উঠল প্রকৃতির সাথে।

"প্রকৃতি যেন তাঁর সকল অভাব পূরণ করিয়া দিত"।

মানুষের সাথে তার ভাবের বিনিময় না হলেও ভাষাহীন প্রাণী আর প্রকৃতির সাথে ঠিকই হৃদয়তাপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলেছে সুভা। তাই বলা যায় একজন বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন মানুষেরও সংবেদনশীল ও অনুভূতি প্রবণ মন আছে। মন্তব্যটি সুভা ও আমার চেনা/জানা বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন মানুষের পরিপ্রেক্ষিতে যথার্থ।

গমন সংক্রান্ত প্রতিবন্ধী

সাধারণত যে সকল ব্যক্তি চলাফেরার অযোগ্য তাদের গমন সংক্রান্ত প্রতিবন্ধীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়। আমরা এই প্রতিবন্ধীর শিকার মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি' (১৯৩৬) উপন্যাসের মালা চরিত্রটি আলোচনা করছি।

মালা: পদ্মানদীর মাঝি (১৯৩৬): মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদ্মানদীর মাঝি(১৯৩৬) উপন্যাসের কেতুপুরের দশ মাইল উত্তরর্বতী গ্রাম চারডাঙ্গার অধিবাসী বৈকুন্ঠের দুই কন্যার বড় মালা। জেলে পাড়ার মধ্যে তার মতো সুন্দরী মেয়ে আর হয় না। তার যেমন গৌরবর্ণ দেহ তেমনি তার চুলের বাহার। এই অপরূপা মেয়েটির রূপের কোনো কমতি না থাকলেও কমতি রয়ে ছিল তার পায়ে। আসলে পৃথিবীতে কোনো মানুষই নিখুঁত ভাবে আসে না। মালাও তার ব্যতিক্রম নয়, মালা ছিল পুঙ্গু। জন্ম থেকেই তার একটা পা হাঁটুর কাছ থেকে দুমড়ে মুচড়ে বেঁকে যাওয়ায় ওঠা-হাঁটার ক্ষমতা ছিল না। কোনো রকমে সে নড়াচড়া করতে পারত। তার এই অক্ষমতার জন্য ছোটবেলায় পাড়াতুতো ভাইরা যেমন অবহেলা দেখিয়েছে আবার বিবাহের পরবর্তীতে তার সন্তানরাও তার এই অক্ষমতার জন্য তাকে কথা শুনিয়েছে। আসলে মালা ছিল জন্মগত প্রতিবন্ধী। মালার এই শারীরিক প্রতিবন্ধকতা তাকে সকলের কাছে অবজ্ঞার পাত্ররূপে দৃষ্টিজাত করেছিল।

আগেকার সমাজে মেয়েদের বিয়ে দেওয়ার জন্য অন্যতম যোগ্যতা তার রুপ সৌন্দর্য। বর্তমান সমাজেও এই প্রথার প্রচলন থাকলেও তবে তা কিছু মাত্রায় কম। মালার মধ্যে দুটি গুণ-ই উপস্থিত। শুধু তাঁর একটাই খুঁত সে পঙ্গু, যার কারণে বড়বাড়ির রাজরানী হওয়া তার হয়ে ওঠেনি। তাই কুবেরের মতো নিরন্ন দরিদ্র জেলের বাড়িতে পাটরানী হয়ে এসেছিল মালা। এই দরিদ্র পরিবারেই নিজেকে মানিয়ে নিয়ে কুবেরের সংসার আলো করে রেখেছিল মালা।

মালা ছিল চার সন্তানের জননী। কোনো প্রতিবন্ধকতাই জননী সত্ত্বাকে চাপা দিতে পারেনা। মালার এই পঙ্গুত্বতাও তার জননী সত্ত্বাকে চাপা দিতে পারেনি। মালা তার সন্তানদের প্রতি খুব মনোযোগী। জেলে পাড়ার অন্যান্য মায়েদের মতো মালা ছিল না। সন্তানদের প্রতি তার মন সদায় আকুল। সারাদিন পরে পাখির ছানার মতো তার ছেলেমেয়েরা যখন ঘরে ফিরে আসে তখন তারা ভদ্র ও বাধ্য ছেলের মত মায়ের কাছে ঘেঁষে আসে।

"মালার কাছে বসিয়া তাহারা ভাত খায়, এক ছেলের মুখে স্তন গুজিয়ে রাখিয়া আর দুজনকে ভাত মাখিয়া গ্রাস মুখে তুলিয়া খাওয়ানোর মন মালার একার নয়। এমনিভাবে খাওয়াইয়া না দিলে ওরা খাইতে চায় না"।

আসলে গ্রাম্য জীবনের প্রধান বৈচিত্র পরনিন্দা ও পরচর্চা। মালাও এর শিকার, মালার কোল আলো করে যখন তাদের কনিষ্ঠ সন্তান ভূমিষ্ঠ হয় তখন তার গৌণবর্ণ দেখে সকলে মালার সতীত্বের উপর প্রশ্ন তুলেছে। জেলেপাড়ার সকলে মালার সাথে মেজকর্তা অনন্ত তালুকদারের কুৎসা রটিয়েছে। রোদে জলে পুড়ে কুবেরের বর্ণ কালচে তাই জেলেপাড়ার সকলের মধ্যে এই কৌতূহল, অথচ কেউ এটা দেখে না মালার উজ্জ্বল গৌরবর্ণ হতদরিদ্র নিরন্ন সংসারেও সবার চোখ টানে। গ্রাম জীবনের এই ঠাট্টা-তামাশা আসলে পরশ্রীকাতরতাই নামান্তর। কথায় বলে স্ত্রীর প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায় স্বামীর দরিদ্রতায় আর স্বামীর প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায় স্ত্রীর অসুস্থতায়। আলোচ্য উপন্যাসে এই দুটি রূপই বর্তমান। তাই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় স্বামী-স্ত্রীর প্রকৃত স্বরূপ উদঘাটন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। কুবেরের এই হতদরিদ্র সংসারেও মালা শান্তির নীড় রচনা করেছিলেন। আবার কুবেরও মালার এই প্রতিবন্ধকতার জন্য তাকে কোনো দোষারোপ করেনি। আসলে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এই উপন্যাসে শত দরিদ্রতা ও প্রতিবন্ধকতাকে অতিক্রম করে মালা ও কুবেরের সুখী দাম্পত্যের ছবি আঁকতে সচেষ্ট হয়েছিলেন।

ঘরের মধ্যে এক কোণে পড়ে থাকা মালার বহির্জগতের সাথে তার প্রত্যক্ষ কোনো যোগাযোগ নেই। "পঙ্গু বলে বাইরের জগতের সঙ্গে মালার পরিচয় কম"।

জীবনে বেঁচে থাকার রসদ হিসাবে প্রতিবন্ধী মালা রূপকথাকে বেছে নিয়েছিল। এদিক থেকে মালা জেলেপাড়ার এক ব্যতিক্রমী চরিত্র, তার এই রূপকথার শ্রোতা ছিল জেলেপাড়ার আবালবৃদ্ধবণিতা। শুধু নিজের ছেলেমেয়েরা নয়, মালার এই রূপকথা শোনার জন্য এসে জড়ো হয় কুবেরের পিসি থেকে শুরু করে প্রতিবেশী গণেশের স্ত্রী সন্তানরা উলুপি, মনাই, কুকি সাথে সাথে সিধুর তোতলা মেয়ে বগলীও। গল্প শুনতে শুনতে এরা ভুলেই যায় তার নিত্য দরিদ্রক্লিষ্ট জীবনের কথা। মালার মাথায় উকুন, গায়ে মাটি, পরনে ছেঁড়া দুর্গন্ধ কাপড় থাকলেও যখন সে রূপকথা বলে তখন সে যেন এক নিখুঁত ভদ্রমহিলা। এই রূপকথা বলা পরিবেশটিও চমৎকার।

"ডিবরির শিখাটি উর্ধ্বর্গ ধোঁয়ার ফোয়ারা, মাথার উপরে চাল পচা শনের চারিপাশের দেয়ালে চেরা বাঁশের স্যাঁতসেতে ঢেউতোলা মাটির মেঝে," এই পরিবেশে রূপকথা বলাকে মানিক লিখেছেন, - **"আদিম অসভ্যতার আবেষ্টনী, অভিনয় সুমার্জিত সভ্যতার"।**

কুবেরও মাঝে মাঝে মালার রূপকথা মন দিয়ে শোনে, মালা তন্ময় হয়ে রূপকথা বলে। রূপকথা বলার সময় মালা পাড়ার মেয়েদের শালীনতার দিকেও লক্ষ্য রাখে, তখন মালাকে সত্যি আর জেলেপাড়ার বউ বলে মনে হয় না। মালা খুব সংবেদনশীল নারী, তার স্নেহ-মমতা ভালোবাসার কথা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় উপন্যাসের প্রতিটি ফলকে তুলে ধরেছেন।

এই স্নেহময়ী মমতার প্রতিমূর্তি মালার ভালোবাসার টান ছিল তার বাপের বাড়ির লোকজনদের প্রতি, বন্যার সময় স্বামী কুবেরকে বাপের বাড়ি পাঠিয়েছিল মালা। মালার এই পিতৃগৃহ প্রীতিই তার জীবনে নতুন তরঙ্গের সৃষ্টি করেছিল। পঙ্গু স্ত্রী মালাকে নিয়ে কুবের সন্তুষ্ট থাকলেও মালার ছোট বোন কপিলার দুর্বার যৌবনে মুগ্ধ হয়ে শুরু হয় কুবেরের-কপিলার নিষিদ্ধ প্রেম। এই নিষিদ্ধ প্রেমের জোয়ারে একদিকে যেমন কুবের-কাপিলা ভেসে গিয়েছিল ঠিক অপরদিকে ভাটার টানে থিতিয়ে গেল মালা-কুবেরের দাম্পত্য।

কপিলা-কুবেরের এই নিষিদ্ধ প্রেম সম্পর্কে অসহায় প্রতিবন্ধী মালা সবই বুঝতে পেরেছিল ঠিকই কিন্তু কোনদিন সে কোন অভিযোগ করেনি। কুবের-কপিলা এক রাত আমিন বাড়িতে কাটিয়ে এলেও মালা কোনও প্রশ্ন করেনি, কারণ মালা ভাবত কুবের তাকে দয়াবশত বিয়ে করেছে বলে তার একটি গতি হয়েছে। সে আজ জননী হয়েছে, তাই মালা সবকিছু দেখেও না দেখার ভান করে।

মালাও চেয়েছিল নিজের প্রতিবন্ধকতাকে কাটিয়ে সুস্থ সুন্দর স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে। এই প্রতিবন্ধকতা সঙ্গে নিয়ে সারা জীবন চলা তার পক্ষে দুর্ভিসহ হয়ে উঠেছিল। তাই গোপীর সুস্থতা তার মনের মনিকোঠোর সুপ্ত আকাঙ্ক্ষাকে নাড়া দিয়েছিল। সেও চেয়েছিল হাসপাতালে চিকিৎসা করিয়ে তার এই প্রতিবন্ধকতা কাটাতে। কিন্তু তার স্বামী কুবের প্রথমেই তার এই আশা ভেঙ্গে দিয়েছিল।

"তর পায়ের কিছু হইব না গোপীর মা"।

মালার জোরাজারিতে কুবের হাসপাতালে নিয়ে যেতে রাজি না হওয়াতে মালা এতদিন ধরে পুঞ্জিভূত তার মনের ক্ষোভগুলি প্রকাশ করেছে, যা মালার জবানীতে-

"সে তো কপিলার মত ভঙ্গি করিয়া হাঁটিতে পারেনা যে তাকে লইয়া কুবের আমিনবাড়ির হাসপাতালে যাইবে, হোটেলে রাত কাটাইয়া আসিবে পরমানন্দে"।

আসলে মালা নিজের অস্তিত্ব খুঁজে পেতে চায়, প্রথম জীবনে বাবা-ভাই, পরে স্বামী এবং ছেলেদের মুখাপ্রেক্ষী হয়ে থাকার বদলে সে এক নতুন জীবন ফিরে পেতে চায়। কিন্তু তার আশা পূরণ হয়নি, তাকে সারাজীবন এই প্রতিবন্ধকতাকে সঙ্গে নিয়ে চলতে হয়েছে।

হোসেন মিঞার সাম্রাজ্যে অক্ষম পঙ্গুর কোনো স্থান নেই, তাই সেখানে মালার কোন স্থান হল না। কুবেরের পাশে স্থান হল কপিলার, আর পঙ্গু মালা পড়ে রইল এই কেতুপুরেই। তার সন্তানদের জননীরূপে, এখন মালার মাথায় সমস্ত গুরুদায়িত্ব। তাহলে মালা আর অক্ষম কোথায়? আসলে শরীর তার পঙ্গু হলেও মন মালার পঙ্গু নয়। তাই সমস্ত প্রতিবন্ধকতাকে জয় করেছে মা-মালা।

হস্ত সংক্রান্ত প্রতিবন্ধী

কর্মেন্দ্রিয় হাত যাদের দৈনন্দিন জীবনে কর্মক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করে তাদের সাধারনত হস্তসংক্রান্ত প্রতিবন্ধীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়। আমরা এই পর্বে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের "প্রাগৈতিহাসিক"(১৯৩৭) গল্পের 'ভিকু' এবং মনি মুখোপাধ্যায়ের "গণতন্ত্র ও গোপাল কাহার"(১৯৭০-১৯৭৯) গল্পের গোপালের প্রতিবন্ধকতা সম্পর্কে আলোচনা করেছি।

ভিকু: প্রাগৈতিহাসিক(১৯৩৭): মানিক মুখোপাধ্যায়

বাংলা কথাসাহিত্যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় একটি অবিস্মরণীয় নাম, মানুষের আদিম কামনার রূপ ও অস্তিত্বের সংকট কতখানি জটিল ও ভয়াবহ হতে পারে তার প্রকাশ ঘটেছে আলোচ্য 'প্রাগৈতিহাসিক' গল্পে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রাগৈতিহাসিক গল্পে প্রতিবন্ধকতার ধারণাগত ও উৎসগুলো বহুবিধ ও বৈচিত্র্যময়। সেখানে দুর্ঘটনা কিংবা অপরাধ কর্মকাণ্ড শুরু করে জন্মগত ভাবে প্রতিবন্ধীতা প্রাপ্তির বর্ণনা রয়েছে।

প্রাগৈতিহাসিক গল্পে ভিকু বসন্তপুরের বৈকুণ্ঠ সাহার বাড়িতে ডাকাতি করতে গিয়ে কাঁধে বর্শার আঘাত পায়। চিকিৎসার অভাবে ভিকুর ডান হাতটি কর্মক্ষমতা হারায় এবং প্রতিবন্ধকতা শিকার হয়। আর এমনি শক্তপ্রাণ ভিকুর যে শুধু এই আশ্রয়টুকু ছিল তা বিনা চিকিৎসায় ও এক রকম বিনা যত্নেই একমাস মুমূর্ষ অবস্থা কাটিয়ে সে ক্রমে ক্রমে নিশ্চিত মরণকে জয় করে নিল। গাছের মরা ডালের মতো শুকিয়ে গিয়ে অবশ অকর্মণ্য হয়ে পড়ল। প্রথমে অতি কষ্টে হাতটা সে একটু নাড়তে পারত, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে ক্ষমতাটুকুও তার নষ্ট হয়ে গেল। প্রতিবন্ধকতা যে শুধু জন্মগত হয় তা নয়, এর প্রমাণ মিলে এই গল্পে।

প্রাগৈতিহাসিক গল্পে শারীরিক প্রতিবন্ধীক ভিকু একদিন বাজারের একজন ব্যক্তির নিকট সাহায্য প্রার্থনা করলে তাকে দেখতে ছিল অন্যরকম, তার মাথার জট বাধা চাপ চাপ রুক্ষ ধূসর চুল, কোমরে জড়ানো মাটির মতো ময়লা ছেঁড়া কাপড় আর দড়ির মতো শীর্ণ দোদুল্যমান হাতটি দেখে। আর এভাবেই ভিকু 'পৃথিবীর বহু পুরাতন ব্যবসা' ভিক্ষাবৃত্তিতে হাতে খড়ি ঘটে, যদিও মানসিক ও শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধকতাকে উপজীবিকা করে ভিক্ষা করে, কয়েক দিনের ভিতরেই সে পৃথিবীর বহু পুরাতন ব্যবসাটির এই প্রকাশ্যতম বিভাগের আইনকানুন সব শিখে নিয়েছিল। আবেদনের ভঙ্গি ও ভাষা তার জন্মভিখারীর মতো আয়ত্ত হয়ে গেল। শরীর এখন আর একেবারেই সাফ করে না, মাথার চুল তার ক্রমেই জট বাঁধা দলা দলা হয়ে যায় এবং তাতে অনেকগুলো উকুন পরিবার দিনের পর দিন বংশবিস্তার করে চলে। ভিকু মাঝে মাঝে ক্ষ্যাপার মতো দুই হাতে মাথা চুলকায় কিন্তু বাড়তি চুল কেটে ফেলতে ভরসা পায় না। ভিক্ষা করে সে একটি ছেঁড়া কোট পেয়েছিল, কাঁধের ক্ষত চিহ্নটা ঢেকে

রাখার জন্য দারুন গুমোটের সময়েও কোটটা গায়ে রাখত। শুকনো হাতখানা তার ব্যবসার সবচেয়ে জোরালো বিজ্ঞাপন, এই অঙ্গটি ঢেকে রাখলে তার চলে না। কোটের ডান দিকের হাতটি সে বগলের কাছ থেকে ছিঁড়ে বাদ দিয়ে দিয়েছিল। একটি টিনের মগ ও একটি লাঠিও সে সংগ্রহ করেছিল।

"নদীর ধারে ক্ষ্যাপার মতো ঘুরতে ঘুরতে তাহার মনে হয় পৃথিবীর যত খাদ্য ও যত নারী আছে একা সব দখল করিতে না পারলে তাহার তৃপ্তি হইবে না"।

'প্রাগৈতিহাসিক' গল্পে আমরা আরো দুটি প্রতিবন্ধী চরিত্র পাঁচী ও বসিরকে ভিক্ষাবৃত্তিকে পেশা হিসেবে বেছে নিতে দেখতে পাই। পাঁচীর পায়ের ক্ষত ছিল নিরাময়যোগ্য কিন্তু সমাজের অনুকূল্য লাভের হাতিয়ার হিসেবে সে তার ওই প্রতিবন্ধীকতাকে জিইয়ে রাখে এবং এই ঘায়ের দরুন সে ভিকুর তুলনায় বেশি আয় করতে সক্ষম হয়। বাজারে ঢুকবার মুখেই একটি ভিখারিনী ভিক্ষা করতে বসে। বয়স তার বেশি নয়, কিন্তু একটা পায়ে হাঁটুর নীচ থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত তার থকথকে তৈলাক্ত ঘা। এই ঘায়ের জোরে সে ভিকুর থেকে বেশি রোজগার করে। আবার সহজ জীবিকা অর্জনের পন্থা হিসেবে প্রতিবন্ধকতাকে ব্যবহার করার উদাহরণ ভিকু ও পাঁচীর পাশাপাশি বসির নামক চরিত্র দেখতে পাই। ভিকুর মতো বসিরের পা ছিল পক্ষাঘাতগ্রস্ত এবং ভিক্ষাপ্রাপ্তির হাতিয়ার হিসেবে যা কিনা সহজে গোচরিভূত হওয়ার জন্য বিশেষ কায়দায় মেলে রাখা হতো।

প্রাগৈতিহাসিক গল্পের মুখ্য চরিত্র ভিকুকে আশ্রয় করে পাঁচী, বসির ও পেহ্লাদ চরিত্র বিকশিত হয়েছে। এদের চরিত্রে যে আদিম বন্যতা ফুটে উঠেছে তাকে ঘিরেই গড়ে উঠেছে গল্পের কাহিনী। এরা সকলেই প্রাগৈতিহাসিক অন্ধকার যুগের মানুষ ভিকু আদিম হিংস্রতার এক প্রতিনিধি। ডাকাতি তার পেশা, নারী দেহের প্রতি তার অপরিসীম লোভ, মানুষ খুন করতেও নারী অপহরণ এর ব্যাপারে সে কোন বিচার করে না। এ সকল তার কাছে যেমনি সাধারণ তেমনি উপাদেয়। আদিম প্রবৃত্তি তাকে প্রতিনিয়ত তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়, ছোট গল্পের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে-

"শেষ হইয়াও হইল না শেষ"

এই গল্পে ভিকু ছিল একজন প্রতিবন্ধী, তবে তার এই প্রতিবন্ধকতা জন্ম থেকে ছিল না, তার নিজের কারণে সে প্রতিবন্ধী হয়েছিল। সে প্রতিবন্ধী হওয়ার কারণে তার জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে যার কারণে সে ভিক্ষা করে। তাকে ভিক্ষা করতে হতো না যদি সে সঠিক চিকিৎসা পেত। আমাদের সমাজে প্রতিবন্ধী মানুষদের অন্য চোখে দেখা হয়। তাদের পাশে দাড়ানোর মতো মানুষ খুবই কম, তাদের মনোবল বৃদ্ধির জন্য তাদের পাশে কাউকে দরকার হয়, কিন্তু তাদের পাশে থাকারও মানুষ এই সমাজে নেই। এই গল্পে যদি ভিকু পাঁচী, বসির এদের পাশে যদি কেউ দাঁড়াতো তাদের প্রতিবন্ধকতাকে দূরে

সরিয়ে রেখে তাহলে তাদের এই অবস্থা হত না। প্রতিবন্ধীরা আমাদের সমাজের বোঝা নয়, তারাও আমাদের সমাজেরই অংশ।

গোপাল কাহার: গণতন্ত্র ও গোপাল কাহার(১৯৭০-১৯৭৯): মনি মুখোপাধ্যায়

রাষ্ট্রশক্তির সন্ত্রাস ও অত্যাচার সইতে সইতে কিভাবে অসহায় সাধারণ মানুষ সোচ্চার হয়ে ওঠে তার গল্প মনি মুখোপাধ্যায়ের 'গণতন্ত্র ও গোপাল কাহার'। ১৯৬৭ সালে শুরু হওয়া নকশাল আন্দোলনকে কেন্দ্র করেই এই গল্পটি লেখা। এই আন্দোলনের মূল লক্ষ্য ছিল তরাইয়ের সব জমি কৃষকদের হবে। এই গল্পের নায়ক চরিত্র গোপাল কাহার, গোপাল ছিল প্রতিবন্ধী। কিন্তু এটা তার জন্মগত প্রতিবন্ধকতা ছিল না, এই গল্পে গোপালের দরিদ্রতা, অসহায়তা, প্রতিবন্ধত্ব এবং জীবনে ঘুরে দাঁড়ানোর কথা বর্ণিত হয়েছে।

দরিদ্রতা মানুষের মানসিক দিকের ক্ষতি করে, গোপাল ছিল জন্মগত দরিদ্র, সবসময় ক্ষুধার জ্বালা তার লেগেই থাকত, আর এই জ্বালা শুধু তার পেটে নয় মনেও ছিল। তাই সবসময় সে যেন এক অন্য জগতে বাস করত। তার পরিচয় আমরা গল্পের প্রথমেই পায়- **"সে জন্মাবধি দরিদ্র বলে সকল সময় ক্ষুধায় কাতর বলে, মনের দিক থেকে সে সকল সময় একটু অপ্রস্তুত"।**

নকশাল আন্দোলন এই সময়কার কৃষকদের গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। তাই তারা বিভিন্ন আন্দোলনের মাধ্যমে জমি দখল করার কাজে উৎসাহী হয়ে পড়ে। এই গল্পে গোপালও এই হতদরিদ্র কৃষকদের একজন প্রতিনিধি। সেও এই একই কাজ করছিল- **"গেল বর্ষার মরসুমের আগে তারা এ তল্লাটের গরীবগুরবো মানুষগুলি মিলে ঝুলে, মিটিং, মিছিল করে বড়ো জোতদার প্রসন্ন হালদার মশায়ের রেললাইন বরাবর কিছু বেনাম জমি দখল করেছিল"।**

জমি দখল করে গোপালের বছরের চারমাস ভালোই কাটছিল। বাকি মাসগুলি সে লোকের জনমজুর খেটে এবং তার স্ত্রী পরের বাড়ির ভানাকোটা করে কোন রকমে চালিয়ে নিয়েছিল। কিন্তু এবছরই দখিল জমি আর দখলের রাখা সম্ভব হল না। জমিদার প্রসন্ন হালদার তার জমি উদ্ধার করতে সচেষ্ট হলেন। গোপাল কাহার এই সত্যটি উপলব্ধি করল যে তার উচ্ছেদ নিশ্চিত। বছরের যেই চারমাস তারা নিশ্চিন্তে থাকত সেই চারমাসও অনিশ্চিন্ত আটমাসের সাথে যুক্ত হল। ক্ষুধার্ত, পরিশ্রান্ত অনিশ্চিত ভবিষ্যতে আক্রান্ত গোপাল কাহারের ভগ্নপ্রায় বাড়িতে পুলিশ হাজির হয় তাকে গ্রেফতার করার জন্য। সামান্য ভুল বুঝাবুঝিতে পুলিশ ধারণা করে গোপাল আই.বি-র লোককে খুন করেছে। পুলিশের দৃঢ় বিশ্বাস গোপাল গণতন্ত্রের পক্ষে ভীষণ মারাত্মক।

গণতন্ত্র একটি বিশেষ শাসনব্যবস্থা। যেখানে সাম্য হল মূল ভিত্তি। সামাজিক ক্ষেত্রে সাম্য, রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে সাম্য, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সাম্য বর্তমান থাকলেই যথাক্রমে সামাজিক, রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক গণতান্ত্রের সৃষ্টি হয়। এই গল্পে মনি মুখোপাধ্যায় গণতন্ত্রের উপর একপাক্ষিক আলোকপাত করেছিলেন অসহায় নিরাপরাধ গোপাল কাহারকে গ্রেপ্তার করানোর মধ্য দিয়ে। যার গণতন্ত্রের 'গ' সম্পর্কে কোনো ধারণা নেই সে নাকি গণতন্ত্রের হত্যা করেছে। তার পরিচয় পাই গোপালের জবানীতে-

"ওই যে কি নাম বইললেন গণতন্ত্র না কী। বিশ্বাস করেন বাবু, ওনাকে আমি চিনিও না। কুন দিন দেখি নাই, কোথায় থাকেন তাও জানিনে"।

এই মিথ্যে গণতন্ত্র হত্যা-র অপরাধস্বরূপ তার জীবনে নিয়ে আসে প্রতিবন্ধকতা। এই মিথ্যে রাষ্ট্রের সন্ত্রাসের চক্রান্ত। গণতন্ত্রকে রক্ষা করার জন্য গোপাল কাহারের বাঁ হাতখানি বিসর্জন দিতে হয়। **"গোপালের বাঁ হাতটা পিছন দিক দিয়ে মুচড়ে আস্তে আস্তে চাপ বাড়াতে লাগল যাদব। ক্রমাগত চাপে গোপালের মুখ বিকৃত হয়ে উঠতে লাগল। মনে হচ্ছে কাঁধ থেকে বুঝি হাতটা ছিঁড়ে আসবে"।**

অসহায় নিরাপরাধ গোপাল কাহারের উপর যে অন্যায় ঘটেছে, সেই অন্যায়ের প্রতিরোধ গড়ে তুলতে গোপাল শপথ নেয়- **"সে স্থির করিয়া ফেলিয়াছে, যে গণতন্ত্রের জন্য সে বাঁ হাতখানি সেলামি দিয়েছে, সেই গণতন্ত্রকে ভাঙ্গিয়া সকলের ব্যবহারযোগ্য একটা নতুন গণতন্ত্রের জন্য তাহার দক্ষিণ হাতখানিও সেলামি দিবে"।** অস্তিত্বের সংকট থেকেই জন্ম নেয় নতুন সংকল্পের নতুন সংগ্রামের, যার জন্য শত শত প্রতিবন্ধকতাকেও সঙ্গী করতে ইচ্ছুক গোপাল কাহার।

কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত

কুষ্ঠ রোগে অঙ্গহানি শুধু না, মানুষের মৃত্যু পর্যন্ত হত। এই রোগটি ছোঁয়াচে বলে রোগীকে একঘরে রাখত সমাজ। বর্তমানে রোগ নিরাময়ের ওষুধ বের হলেও রোগীদের মধ্যে আতঙ্ক রয়ে গেছে। আমরা এই পর্বে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় 'কুষ্ঠ রোগীর বউ' (১৯৪১-৪৩) গল্পের যতীনের প্রতিবন্ধকতা সম্পর্কে আলোচনা করেছি।

যতীনঃ কুষ্ঠ রোগীর বউ (১৯৪১-৪৩): মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কুষ্ঠ রোগীর বউ' (১৯৪১-৪৩) নামকরনেই প্রতীত হয় নায়িকা মহাশ্বেতার জীবন ইতিহাস। মহাশ্বেতার স্বামী যতীন। বয়স আঠাশের কোটায়। যতীন ছিল বাবার একমাত্র সন্তান। তার বাবা ছিল প্রভূত সম্পত্তির অধিকারী। যতীনের সচ্ছল জীবন এবং সুখী দাম্পত্যের মাঝে হঠাৎ-ই ছেদ টানল আঙুলে কুষ্ঠরোগের আক্রমণ।

"লোকে যা বলিয়াছিল অবিকল তাই, একেবারেই কুষ্ঠব্যাধি"

যতীনের ব্যাধিটি যে দুরারোগ্য কুষ্ঠ তা স্থির নির্ধারিত হবার পর থেকেই যতীন এবং মহাশ্বেতার মাঝে দূরত্ব তৈরি হতে থাকে। মহাশ্বেতা যতীনের সেবা শ্রুশূষা করলেও এই দুরারোগ্য ব্যাধিটি ছোঁয়াচে জেনে সে নিজেকে ক্রমশই নির্বাসিত করে ফেলে। কিন্তু স্ত্রীর প্রতি ভালবাসা তাকে তাঁর স্ত্রীর থেকে আলাদা করতে পারেনি। কিন্তু একসময় দুটি চরিত্রের মধ্যেই বদল ঘটে। আর মহাশ্বেতা, যে স্বামীকে ভালোবাসত আর রাস্তায় কুষ্ঠরোগীদের ঘৃণা করত, সেই মহাশ্বেতা গল্পের শেষে স্বামীকে ঘৃণা করল আর ভালোবাসল কুষ্ঠব্যাধি আক্রান্ত মানুষগুলিকে।

মহাশ্বেতার মত বলিষ্ঠ নারী চরিত্র বাংলা সাহিত্যে সত্যিই দুর্লভ। এক রোমান্টিক একনিষ্ঠ পতিপ্রেম পরায়ণা স্ত্রী মহাশ্বেতার জীবনের প্রখর লড়াইয়ের কারণ স্বামী যতীন। যে স্বামীর রূপে মুগ্ধ হয়ে একদিন সেই গর্ববোধ করত, কিন্তু আজ সেই স্বামীর রূপে কোনো সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য কিছুই নেই। আছে শুধু স্ত্রীর প্রতি সন্দেহ যা তাদের সম্পর্কে দূরত্ব বাড়িয়ে ফাটল সৃষ্টি করেছে।

যতীন আর মহাশ্বেতার দাম্পত্য সম্পর্ক ছিল ঈর্ষনীয়। পারস্পরিক ভালোবাসা বিশ্বাসের দৃঢ়তায় তারা সন্তানের স্বপ্ন দেখেছিল। মহাশ্বেতার গর্ভস্থ সন্তান যখন ছয়মাসের তখনই যতীনের কুষ্ঠব্যাধি দেখা দিয়েছিল। এই কুষ্ঠরোগ শুধুমাত্র যতীনের শরীরে থাবা বসালো না, যতীনের মনকেও কুড়ে কুড়ে খেতে লাগলো ভয়াবহ কুষ্ঠ। যার ফলাফল তাদের সন্তানের মৃত্যু।

প্রতিবন্ধকতা এমন একটা রোগ যা মানুষকে ক্ষতির চরম পর্যায়ে নিয়ে যায়। যতীন ছিল শারীরিক প্রতিবন্ধী, কিন্তু যখন তার এই প্রতিবন্ধকতা সম্পর্কে সে জানতে পারলো যে সে আর সুস্থ হবে না, সেই দিন থেকে সে মানসিক দিক থেকেও ভেঙে পড়েছিল। যেই স্ত্রীর প্রতি তার অগাদ বিশ্বাস, ভালোবাসা ছিল সেই স্ত্রীর উপরেই সে অবিশ্বাস করতে থাকে। এবং এই রোগের জন্য যতীন মহাশ্বেতাকে দায়ী করে।

“যতীন আজ প্রাণপণে চেঁচাইয়া বলেঃ তোমার পাপে আমার এমন দশা হয়েছে, ছেলে খেকো রাক্ষসি, তুমি মরতে পারনি? না, সাধ আহ্লাদ এখনও মেটেনি? এখনও বুঝি একজন খুব ভালোবাসছে?”।

ইতিমধ্যে তাদের সন্তানের মৃত্যু ঘটে। ফলে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের গ্রন্থিসূত্রটিও হারিয়ে যায়। যতীন জানে মহাশ্বেতা স্ত্রী হিসেবে স্বামীর সেবা করেছে। কিন্তু স্বামী হিসেবে কি সে স্ত্রীর চাহিদা পূরণ করতে পারবে? মহাশ্বেতা রক্ত মাংসের মানুষ, তাই জীবনে কি অন্য পুরুষের প্রতীক্ষার আসবে? এইসব চিন্তাভাবনা যতীনকে করে তোলে আরও অসহায়। ফলে দিন দিন তার প্রতি হিংসা এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে, এই রোগটি ছোঁয়াচে জেনেও তাঁর স্ত্রীর হাতে তার স্পর্শ করে, যাতে মহাশ্বেতাও এই দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হয়।

"হিংস্র ক্রোধের বশে যতীন আঙুলের ক্ষতগুলি মহাশ্বেতার হাতে জোরে জোরে ঘসিয়া দেয়। আগুন দিয়া আগুন ধরানোর মতো সংক্রামক ব্যাধিটাকে সে যেন মহাশ্বেতার দেহে চালান করিয়া দিয়াছে, এমনি একটা উগ্র আনন্দে অভিভূত হইয়া বলেঃ ধরল বলে, তোমাকেও ধরল বলে! আমাকে ঘেন্না করার শাস্তি তোমার জুটলো বলে, আর দেরি নেই"।

জীবনে প্রতিবন্ধকতা আসলে সেই প্রতিবন্ধকতাকে জীবন থেকে দূর করবার জন্য মানুষ তার সাধ্যের মধ্যে যা যা হয় তাই করার চেষ্টা করে। যতীনও তাই করেছিল। যতীন ছিল নাস্তিক। কিন্তু মহাশ্বেতার মুখে ঈশ্বরের আরাধনা করলে এই প্রতিবন্ধকতা থেকে তার মুক্তি ঘটবে শুনে কামাখ্যা দেবী শরণাপন্ন হয়। দেবতার চরণে সমস্ত কিছু অর্পণ করে দেবতার শক্তিকে অকৃত্রিম বিশ্বাসে যতীনের অশান্ত মন শান্ত হয়।

"কয়েকদিন ভাবিয়াই প্রত্যাদেশে তাহার অক্ষুন্ন বিশ্বাস জন্মিয়া গিয়াছে। দেবতা একদিন যার কাছে অলস কল্পনা, ধর্ম ছিল বার্ধক্যের ক্ষতিপূরণ, জ্ঞান ছিল অনমনীয় যুক্তি, আজ সে আশা করিতে আরম্ভ করিয়াছে দেবতার যদি দয়া হয়, হয়তো আবার সুস্থ হইয়া ওঠার পথ দেবতাই তাহাকে বলিয়া দেবেন"।

আসলে যতীনের এই ভয়াবহ রোগের পিছনে তার বাবার প্রভূত সম্পত্তির পিছনের ইতিহাসের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন মানিক। এখানে তাই যতীনের এই ব্যাধি আসলে তার বাবার অন্যায় ভাবে অপরিমিত অর্থসঞ্চয়কারী মানুষদের উপর আসা বঞ্চিত নিপীড়িত শোষিত মানুষদের চোখের জল অভিশাপের ফসল।

"তবুও সংসারে চিরকাল পূরণের জয় এবং পাপের পরাজয় হইয়া থাকে এই কথা প্রমাণ করবার জন্যই যেন জমা করা টাকাগুলি হাতে পাইয়া ভালো করিয়া ভোগ করিতে পাবার আগেই মাত্র আটাশ বছর বয়সে যতীনের হাতে কুষ্ঠরোগের আবির্ভাব ঘটিল"।

আমরা জানি, পাপ তার বাপকেও ছাড়ে না। তাই যতীন-ই বা তার ব্যতিক্রম হবে কেন। আসলে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় আলোচ্য উপন্যাসে একজন প্রতিবন্ধী মানুষের মনোবিকৃতির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন।

মানসিক প্রতিবন্ধী

এই পর্বের চরিত্ররা হলেন মানসিক প্রতিবন্ধী। কেউ মানসিক দিক থেকে বিপর্যস্ত, আবার কেউ উন্মাদ। এখানে আমরা মোহাম্মদ লুৎফর রহমানের 'সরলা'(১৯১৮) উপন্যাসের সরলা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'মালঞ্চ'(১৩৪০বঙ্গাব্দ) উপন্যাসের নীরজা এবং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সরীসৃপ'(১৯৩৯)

গল্পের চারুর স্বামী ও পুত্র ভবন, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'রাধারানী'(১৯৭৫) উপন্যাসের রাধারানী এছাড়াও মনীষ ঘটকের 'পটলডাঙ্গার পাঁচালী'(১৯৫৬) গল্পগ্রন্থের নিম্নবৃত্ত শ্রেনীর জীবনের প্রতিবন্ধকতা তুলে আলোচনার চেষ্টা করেছি।

সরলাঃ সরলা(১৯১৮): মোহাম্মদ লুৎফর রহমান

'সরলা' উপন্যাসটি একটি সামাজিক উপন্যাস। বিংশ শতাব্দীর সামাজিক পটভূমি নিয়ে আলোচ্য উপন্যাসটি গড়ে উঠেছে। আলোচ্য উপন্যাসের নায়িকা সরলার জীবনযন্ত্রণার কথা ব্যক্ত করা হয়েছে। যেহেতু আমাদের প্রকল্পের বিষয় কথাসাহিত্যে প্রতিবন্ধী চরিত্রগুলির জীবন অন্বেষণ। তাই আমরা এই উপন্যাসে প্রতিবন্ধী চরিত্রগুলি খুঁজে তাদের জীবনে প্রতিবন্ধকতা কতটা ছাপ ফেলেছে তা অনুধাবন করার চেষ্টা করছি।

যশোর জেলার অন্তর্গত হরিহরপুর গ্রামের এক ব্রাহ্মণ পরিবারের ধার্মিক মেয়ে সরলা। পঁচিশ বছরের প্রাণবন্ত মেয়ে সরলা, বিলাস নামে এক অষ্টাদশ বর্ষীয় বালকের সাথে প্রণয়ে লৃপ্ত হয়ে পড়ে। এই প্রণয় তাকে মানসিক শান্তি দিলও সেই শান্তি বেশি দিন স্থায়ী হয়নি। যৌবন বয়সের কামনাকে সংবরণ করতে না পেরে তারা পরকীয়ায় লিপ্ত হয় এবং যার ফলস্বরূপ সরলা সন্তান সম্ভবা হয়ে পড়ে। আর এইখান থেকেই সরলার মানসিক প্রতিবন্ধকতার পথ চলা শুরু হয়। একদিন যে প্রণয় তার জীবনে অপার সুখ-শান্তি এনে দিয়েছিল আজ সেই প্রণয়-ই তার জীবনে প্রতিবন্ধকতাকে এনে দিয়েছে। তাই আমরা সরলার মুখে শুনতে পেয়েছি- **"আমার সকল সুখ এখানেই থামিয়া গেল! সমাজে মুখ দেখইব কি করিয়া? বিলাসেরই স্থান হইবে কোথায়? এই দ্বিতীয় দুর্ঘটনার ফলে মানসিক অবস্থা কি প্রকার হইল তাহা ভাষায় প্রকাশ করিতে পারি না"।**

আসলে সমাজ এমনই একটা জায়গা যেখানে কোনো ভুলের ক্ষমা হয় না, হয় শুধু শাস্তি। সরলর ক্ষেত্রেও অন্যথা ঘটেনি। আবার বিংশ শতাব্দীর সমাজব্যবস্থা মূলত পুরুষকেন্দ্রিক। এখানে নারীরা পুরুষের মুখাপ্রেক্ষী হয়ে থাকে। তাই সরলার গৃহত্যাগের সিদ্ধান্তে বিলাস তাকে সচেতন করেছিলেন- **"কোথায় যাইবে, কে আশ্রয় দিবে? পুরুষ স্বাধীন ভাবে আত্মমর্যাদা বজায় রাখিয়া আপনার দুর্বলতাকে স্বীকার করিয়াও নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে"।** কিন্তু সমাজ ভালো-মন্দের মিশ্রণে গড়ে ওঠে। সমাজে যেমন মন্দ মানুষ আছে, তেমনি ভালো মানুষও আছে। আলোচ্য উপন্যাসে এরকমই একজন ভালো মানুষ আহামদ। এই মুসলিম ছেলেটি ভাইয়ের মতো সরলাকে এই অচেনা শহরে তাঁকে অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থানের জোগাড় দিয়ে তার মানসিক যে অশান্তি তার কিছুটা হলেও লাঘব ঘটিয়েছিল। কিন্তু হঠাৎ একদিন আহামদ-এর মৃত্যু তার জীবনে আবার অন্ধকার নিয়ে আসে। তার প্রতি সমাজের যে

ঘৃণা তা তার মানসিক চাপ আরও বাড়িয়ে দেয়। সে লোকের দরজায় দরজায় ঘুরে আশ্রয়ের জন্য কিন্তু অপমান, অবজ্ঞা ছাড়া তার ভাগ্যে আর কিছু জোটেনি। একদিন যে আশা নিয়ে সে ধর্ম পরিবর্তন করেছিল আজ সেই ধর্মপরিবর্তন-ই তার জীবনে কাল হল। সরলা লোকের বাড়িতে কাজ চাইতে গেলে তাকে শুনতে হয়েছে- **"ওমা তুমি বামুনের মেয়ে! মুসলমান হয়েছো, যাও যাও এখানে স্থান হবে না"।**

আমাদের সমাজ এমনই পাষন্ড যে দুঃখী মানুষের বেদনায় তার মন গলে না। তার পরিচয় পাই আলোচ্য উপন্যাসে, সরলার সন্তান প্রসবকালে সরলা রাস্তার মানুষদের কাছে সাহায্য চাইলে তারা কেউ তাকে অপমান, আবার কেউ মুখ ফিরিয়ে চলে যায়- **"বাবা! একটু জল, পিপাসায় আমার কণ্ঠ ফাটিয়া গেল। সে একটু হাসিয়া চলিয়া গেল"।**

ভগবান কাউকে সবদিক থেকে মারে না, কোন না কোন দিক তার সামনে খোলা রাখে। তাই ঈশ্বর যেন সরলরাকে উদ্ধারের জন্য কোনো না কোনো ব্যক্তিকে পাঠিয়ে দেন। সুরেন বাবু নামে এক সৎ ব্যাক্তি সরলাকে আশ্রয় দিয়েছিলেন। পরে তিনি আবার সরলাকে মি.মর্ণো নামে এক খ্রিস্টান ব্যক্তির দেখাশোনার জন্য বহাল করেন। এখান থেকেই সরলা জীবনের স্বাভাবিক ছন্দে ফিরতে শুরু করলেও তার জীবনে প্রতিবন্ধকতা লেগেই ছিল। মি.মর্ণো সরলার বিয়ে দেন এমন এক ব্যক্তি সঙ্গে যে পূর্বে মানসিক দিক থেকে বিপর্যস্ত করেছিল। যা আমরা সরলার মুখে শুনতে পাই- **"মনে পড়ে? আমার তখন পেট উঁচু ছিল। বারবিলাসিনী মনে করিয়া কি বলিয়াছিলে, মনে আছে? সে কথাগুলি এখনও আমার কানে বাজিতেছে? মনে পড়ে কি সেই কথাগুলি? কামরা হইতে লাফাইয়া বাহিরে আসিয়া বলিয়াছিলে- 'ওরে! বোডিংঘরে অতঃপর শ্রীমতি কুসুম কুমারীর প্রবেশ'! মনে পড়ে? তারপর গলায় ধাক্কা দিয়ে পথে বাহির করিয়া দিয়েছিলে"।**

সরলা আজ ঘুরে দাঁড়িয়েছে, যে সমাজ একদিন তাকে বারবিলাসিনী, বেশ্যা, উক্ত বিশ্লেষণগুলি প্রয়োগের মাধ্যমে তাঁকে সমাজের নীচ-শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করেছিল, আজ সেই সমাজের মানুষ তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছে। সরলার সাথে ঘটে চলা সামাজিক অন্যায়গুলি তাকে যেভাবে বিপর্যস্ত করে তুলেছিল, তা অন্যকরো সাথে যাতে না হয় তার যথাসম্ভব চেষ্টা করেছে- **"সরলা ও সুরেন বাবুর যত্নে ও ঔষধের শক্তিতে রোগীর অবস্থা ক্রমশ ভালো হইতে লাগিল"।** কারণ এই মানসিক প্রতিবন্ধীকতার একজন ভুক্তভোগী হল সরলা।

যেই প্রণয় সরলার জীবনে প্রতিবন্ধকতা নিয়ে এসেছিল, সেই প্রনয়-ই উপন্যাসের শেষে তাকে আবার মানসিক শান্তি দিয়েছিল। উপন্যাসের শেষে সরলা ও বিলাসের দেখা হলে সরলা এই প্রতিবন্ধীকতা থেকে বেরিয়ে জীবনের মূল ছন্দে ফিরতে পেরেছিল। যার প্রমান পাই সরলার লেখা

চিঠিতে- **"প্রিয় দাদা, সুরেন বাবু। আমার স্বামী আমাকে লইতে আসিয়াছেন। তিনি সন্ন্যাসী, আমি এক মুহূর্তও দেরি করিতে পারলাম না"।**

এইভাবে আমাদের সমাজে নিত্য কত কত মানুষ মানসিক দিক থেকে দিশেহারা হয়ে কেউ মাদকাসক্ত আবার কেউ মৃত্যুর কোলে ঢোলে পড়ছে। তবে খুব কম জনেই আবার জীবনের আলোতে ফিরতে পেরেছে, তবে আমাদের উপন্যাসের নায়িকা সরলা এই অল্প জনের মধ্যে একটি দৃষ্টান্তস্বরূপ।

চারুর স্বামী ও পুত্র: সরীসৃপ(১৯৩৯): মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সরীসৃপ' ছোট গল্পটি নামে ছোট হলেও আকারে বেশ বড়ো। গল্পে অনেকগুলো চরিত্র থাকলেও এই গল্পের প্রধান চরিত্র চারু, বনমালী এবং পরী। এই তিনজন চরিত্রকে কেন্দ্র করেই গল্পের কাহিনী আবর্তিত, মনস্তত্ত্ব আবর্তিত সাথে সাথে নাটকীয়তা, যৌনতা, প্রেম, ভালোবাসা এবং হিংসা বিদ্বেষ, প্রতিযোগিতা এই সব কিছুই আবর্তিত হয়েছে চারু, পরি এবং বনমালীকে কেন্দ্রে রেখে। এছাড়াও রয়েছে চারুর ছেলে ভুবন, যে স্বাভাবিক সন্তান নয়। এক ধরনের প্রতিবন্ধকতা তার মধ্যে রয়েছে। আবার চারুর স্বামীও ওই একই প্রতিবন্ধীকতার শিকার। চারুর স্বামী বুদ্ধি প্রতিবন্ধী। লোকে যাকে পাগল বলে। তার স্বামীর এই প্রতিবন্ধকতা জিনগত ভাবে তার পুত্র ভবনের মধ্যে দেখা দিয়েছে। তার বয়স বাড়লেও বুদ্ধির বিকাশ হয়নি। ভুবনের প্রতিবন্ধকতাকে মানিক বন্দোপাধ্যায় গল্পে দেখিয়েছেন এইভাবে- **"ঘরের ভিতর হইতে ভুবন থুপথুপ করিয়া পা ফেলিয়া আসিয়া দাঁড়াইল। সে অত্যাশ্চর্য মোটা। তাহার গলায় দুটি খাঁজ আছে, মনে হয় গালেও খাঁজ পড়িবে"।**

বুদ্ধিমতী চারু নিজের বুদ্ধির জোরে সংসারের ভার নিলেও নিজের স্বামীর প্রতিবন্ধকতা তাকে সবদিক থেকে পিছিয়ে রেখেছিল। মাত্র সতেরো বছর বয়সে চারুর বিবাহ হয়। বিবাহের পর তার শশুর রামতারণ বাড়ির বাইরে কোথাও গেলেই বনমালীকে পাহারায় বসিয়ে যেত, কারণ পাগল পুত্রের প্রতি তার কোনো ভরসা ছিল না। চারুর স্বামী একমাত্র তার বাবাকেই ভয় করত। যার প্রমাণ পাই-

"স্বামী গোলমাল করিলে সবাই বলিত, চুপ চুপ! বাবার হুকুম, এবং রামতারণকে তাহার ছেলে এমনি যমের মতো ভয় করিত যে আর কথাটি না কহিয়া সে শান্ত শিশুর মতো ঘুমাইয়া পড়িত"।

কিন্তু চারুকে বেশিদিন তার স্বামীর অত্যাচার সহ্য করতে হয়নি, অল্প বয়সেই তার স্বামীর মৃত্যু হয়।

চারু তার মানসিক ভারসাম্যহীন পুত্র ভুবনের চিকিৎসার জন্য বাড়ি ঘর বনমালীর কাছে শর্তসাপেক্ষে বন্ধক রাখলেও সেই শর্ত না মানায় বনমালী সেই বাড়ি নিয়ে নেয় অতি নিখুঁত কৌশলের মাধ্যমে। চারু সবকিছু বুঝতে পারলেও পাগল ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে সে কিছু বলতে পারতো

না। কারণ যদিও এই বাড়িতে থাকার অধিকার টুকু পেয়েছে সেটা চলে গেলে পাগল ছেলেকে নিয়ে কোথায় যাবে এবং তার মৃত্যুর পর তার ছেলেকে কে দেখবে এই ভেবেই সে সবকিছু মেনে নিত। তাই- **"অতিথির আদর ও সম্মান পাইয়া চারু তার নিজের বাড়িতে বাস করিতে লাগিল"।**

বনমালীর যৌবনের প্রেমিকা চারু আজ বার্ধক্যে উপনীত। নানা রকম রোগ তার শরীরে বাসা বেঁধেছে। পাগল স্বামীও মারা গেছে চারুর। একমাত্র পুত্র ভুবন সেও জড়বুদ্ধিসম্পন্ন। এরকম পরিস্থিতিতে তাদের জীবনে এসে হাজির হয় চারুর ছোট বোন পরী। পরীও সদ্য বিধবা। চারুর মতো পরীরও একমাত্র ভরসা তার ছেলে। দুই বিধবা রমনীর জীবন আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু বনমালী। পরী দেহ দিয়ে নিজের ভবিষ্যৎকে উজ্জ্বল করতে বনমালীর মন আকর্ষণের চেষ্টা করলেও চারু তা করেনি। একমাত্র পাগল পুত্র ভুবনের ভবিষ্যতের কথা ভেবেই সে বনমালীকে হাতে রাখতে চেয়েছিল। এবং শেষে তা না পারায় চারু ভুবনের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে দ্বিধান্বিত হয়-

"হয়তো ভুবনকে না দিয়া এ বাড়িটা সে পরীকেই দান করিবে, বলিবে, ভুবন আর বাড়ি নিয়ে করবে কি চারুদি? পরীকেই দিয়ে দিলাম"।

'মা' শব্দটা এমন-ই যেখানে বিশ্বের শান্তি লুকিয়ে থাকে। এই মায়ের আঁচলের মধ্যে আমরা যতদিন থাকি আমাদের কোনো বিষয়ে কোনো ভাবনা থাকে না। কারণ আমরা জানি ভাবার জন্য আমাদের মা রয়েছে। তাই গল্পে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় চারুর মাতৃসত্ত্বার যথার্থ প্রকাশ ঘটিয়েছেন। চারুর মৃত্যুর পর তার পাগল ছেলের অবস্থা কীরূপ হবে তা দেখার জন্য ছলনা করে তারকেশ্বর যায় এবং ফিরে এসে চাকরের কাছে সব জানে যে, ভুবন চারুর অবর্তমানে কেমন থাকবে। তা এইরূপ- **"পদ্ম জানাইল সকলের ভাবসাব মন্দ নয়, আবার ভালোও নয় কিন্তু দুয়ের মাঝামাঝি, পরী তার বোনপোকে ঠিক সময় মত না হোক ডাকিয়া খাওয়াইছে, মার জন্য হাউহাউ করিয়া কাঁদিলে ভোলানোর চেষ্টাও সে করে নাই এমন নয়। তবে চোখে চোখে ওকে কেউ রাখে নাই"।**

কলেরায় আক্রান্ত হয়ে চারুর মৃত্যু হলে অনাথ ভুবন বনমালীর আশ্রয়েই থাকে। যে বনমালী চারুকে স্ত্রীর মর্যাদা দিতে পারেনি। সেই বনমালীই চারুর ছেলেকে নিজের সন্তানের মত আগলে রাখল। মায়ের মৃত্যুর পর ভুবনের মধ্যেও অনেক পরিবর্তন এল। ভুবনের এই মানসিক স্থিতির উন্নতি অনেকাংশে অনুপ্রাণিত করে বনমালীকে। বনমালী ও ভুবনের পারস্পরিক সম্পর্কের উন্নতি ঘটতে থাকে যার ফলস্বরূপ-

"খাওয়ার সময় বনমালী ভুবনকে কাছে খাইতে বসায়, প্রায়ই তাহাকে সঙ্গে লইয়া মোটর চাপিয়া বেড়াইতে যায়, অবসর সময়ে কাছে ডাকিয়া তাহার সঙ্গে কথা, তাহাকে নানা বিষয় শিখাইবার চেষ্টা করে"।

মানসিক দিক থেকে বিপর্যস্ত মানুষদের মনে স্বাভাবিক মানুষদের মতো এত জটিলতা থাকে না। তারা সব কথাকে সহজেই বিশ্বাস করে নেয়। আসলে তাদের মন তো বাচ্চা শিশুর মতো, তাই তো পরী ভুবনকে তার মায়ের কাছে নিয়ে যাবে বলতেই এককথাতেই ভুবন রাজি হয়ে যায়। **"মার কাছে যাবি, ভুবন?"** পরী এই অসহায় মানসিক দিক থেকে দুর্বল ছেলেটিকে অজানা অচেনা পৃথিবীর দিকে ঠেলে দেয়। যার প্রমাণ পায়- **"দরাজ হাতে অনেকগুলি নোট কাউন্টারের ওপাশে চালান করিয়া দিয়া বোম্বে পর্যন্ত ফার্স্টক্লাসের একখানা টিকিট কিনিয়া গাড়ি ছাড়ার অল্প আগে ভুবনকে বোম্বে মেলের একটি খালি ফাস্টক্লাস কামরায় তুলিয়া দিল"।**

আসলে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় দেখিয়েছেন ভুবন জড়বুদ্ধিসম্পন্ন নির্বিকার চরিত্র হলেও তার মাধ্যমেই মানবমনের গূঢ় জটিলতা সরীসৃপের রূপে বিস্তারিত হয়েছে।

নিম্নবৃত্ত শ্রেণি : পটলডাঙ্গার পাঁচালী(১৯৫৬): মণীষ ঘটক

মনীষ ঘটকের 'পটলডাঙ্গার পাঁচালী' গল্পগন্থে বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভের অর্থনৈতিক অবক্ষয়, কিভাবে মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে ধ্বংসের কিনারায় টেনে নিয়ে যাচ্ছে তার বাস্তব সম্মত বর্ণনা রয়েছে। এছাড়াও সমাজে ক্ষমতাবানের অধিপত্য স্থাপনের প্রচেষ্টা, মানুষের দরিদ্রজনিত চরিত্রের অবনতি, অর্থ উপার্জনের নেশায় অন্ধকার জগতের বৃত্তি অবলম্বন প্রভৃতি সমস্যারও বাস্তব চিত্র ফুটে উঠেছে এই গল্পগন্থে। অন্ধকার জগতের চিত্র অঙ্কনে মনীষ ঘটক সিদ্ধহস্ত। 'পটলডাঙ্গার পাঁচালী' গল্পগ্রন্থটি একাধিক গল্পের সমন্বয়ে রচিত। প্রত্যেকটি গল্পেই গ্রন্থকার সমাজের নীচ প্রবৃত্তির মানুষের জীবন যন্ত্রণার কথা ব্যক্ত করেছেন। আমরা জানি মানুষের প্রতিবন্ধকতা শুধু শরীরে নয় মনেও প্রভাব বিস্তার করে। তাই এই গল্পগুচ্ছে মনীষ ঘটক নিম্নবিত্ত শ্রেণীর জীবনসংগ্রামের ছবি দেখাতে গিয়ে সেখানে প্রতিবন্ধকতা আপনা হতেই স্থান পেয়েছে।

'পটলডাঙার পাঁচালী' তে দেখা যায় অন্ধকার জগতের একটা দালালচক্র কিভাবে শিশুদের অপহরণ করে তাদের অসৎ পথে ও হীনবৃত্তি গ্রহণে বাধ্য করেছে। অপহৃত যে ছেলেটা বা মেয়েটা ভালো গাইতে পারে তার চোখ দুটো অন্ধ করে, কিংবা যেকোনো অঙ্গহানি ঘটিয়ে রাস্তায় বসিয়ে ভিক্ষে করায়। আবার যে মেয়েটা দেখতে সুন্দর বা নাচতে পারে তাকে বারাঙ্গনার কাছে বিক্রি করে। এই ছেলেমেয়েদের মধ্যে যারা একটু চালাক প্রবৃত্তির তাদের পকেটমার, চোর, ছিনতাইকারী, মস্তান বা গুন্ডা তৈরি করে। এই ভিন্ন ভিন্ন প্রবৃত্তি বেছে নেওয়ার ক্ষেত্রে তাদের কোন নিজস্ব মতামতকে তোয়াক্কা করা

হয় না। একপ্রকার জোরপূর্বক তাদের উপর বাধ্য করা হয়। এই দিক থেকে তাদের মানসিক ভারসাম্য বিঘ্নিত যেমন হয় তেমনি শারীরিক ভাবেও নানা অক্ষমতা শিকার হয়।

এই গল্পগুচ্ছের বেশিরভাগ গল্পের বিষয় সংঘটিত হয়েছে জীবনের বীভৎসতম অঞ্চল থেকে। এই গল্পের শুরু খেদী পিসির আস্তানার বিবরণ দিয়ে। খেঁদি পিসির বস্তির অধিবাসীরা হল প্রধানত ভিখারী, পকেটমার, ছেলে ধরা, বেশ্যা। এই অসহায় মানুষগুলি সমাজের দূরারোগ্য ক্ষতের মতো বস্তিতে বাস করে। এরা সর্বহারা কিন্তু সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোর বাইরে এদের অবস্থান। এখনকার বাসিন্দারা দিনের পর দিন বাস করে পুঁতিগন্ধময়, মানুষের অবসবাসেরযোগ্য পরিবেশে- **"পটলডাঙ্গার ভিখারিপাড়া। প্যাচপ্যাচে পাঁকের ভেতর ছোট ছোট ভাঙা কুঁড়ে, সার-সার গায়ে গায়ে লাগান রাতদুপুর। সোজা হয়ে দাঁড়ালে মাথায় ঠেকে এমনই একটা হোগলার কুঁড়ের অন্দর। এক কোণে দেয়ালের গায়ে বছর দুয়ের পুরোনো একটা ছেঁড়া কাঁথা, নোংরা ঝুলি, এইসব। জানালা একটিও নেই, ,দোরের ঝাঁপ টানা, দোরগোড়ায় একটা কেরোসিনের ডিবে থেকে মিটমিটে আলো অনর্গল ধোঁয়া বেরুচ্ছে। ধোঁয়ার গন্ধ বাইরের পচা কাদা ও নোংরা আস্তাকুঁড়ের গন্ধ, ঘরের পেছনে দিন দুই হল একটা কুকুর মরে পচে আছে, তার গন্ধ আর কুঠে বুড়ির গলিত ঘায়ের গন্ধ একসাথে ঘরটাকে ভরে রেখেছে"।** আসলে এমন অস্বস্থিকর পরিবেশে সুস্থ স্বাভাবিক জীবন যাপন করা অসম্ভব। এই পরিবেশে যে কোন মানুষই অসুস্থ হয়ে পড়বে। কুঠে বুড়ি, সদি, কানা-গুবরে, নফর এরা এই বস্তি অঞ্চলের বাসিন্দা। এই অন্ধকার জগতে এসে পড়ায় নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য তারাও কোনো না কোনো প্রতিবন্ধকতাকে জীবনের সঙ্গী করেছে। যেমন কুঠে বুড়ি যৌবনে হয়তো বেশ্যাগিরি করলেও বয়স হওয়ায় ভয়ানক ঘায়ের কাছে সে কাহিল হয়েছে। আবার সদির গালের মাংস ছিল না, কানা-গুবরের এই জগতে পদার্পণের ফলে হয়তো তাকে ইচ্ছাবশত কানা করে কোনো প্রবৃত্তি সঙ্গে যুক্ত করেছে। আবার, নফরও কোনো এক কুৎসিত রোগে আক্রান্ত। এইরকম নানা শারীরিক প্রতিবন্ধকতা যেমন তাদের জীবনকে আষ্টেপাষ্টে জড়িয়ে ধরেছিল ঠিক তার সাথে ছিল তাদের মানসিক বিষন্নতা।

এই বস্তি অঞ্চলে সম্পর্কের কোনো দাম নেই। এখানে বাবা-মা, ভাই-বোন, স্বামী-পুত্র কোনো কিছুর মূল্য নেই। এখানে উঠতি বয়সের মেয়েদের বেশ্যালয়ে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এরফলে নিয়মিত শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন এবং প্রতিবছর সন্তানের জন্ম দেওয়ার ফলে একদিকে যেমন তাদের শারীরিক দিকের ক্ষতি হত তেমনি অপরদিকে জীবনবৃত্তিকে টিকিয়ে রাখতে এই অনিচ্ছাকৃত সঙ্গম তাদের মানসিক দিকেরও ক্ষতি করত। এই সমাজে কানা-খড়ার স্থান সবার আগে। কারণ সহজেই এদের ভিক্ষাবৃত্তির কাজে লাগিয়ে দেওয়া যায়। পটলডাঙার তৃতীয় 'কালনেমি' গল্পে আমরা ডাকু নামে এক শারীরিক প্রতিবন্ধীর খোঁজ পেয়েছি। রেলে পা কেটে যাওয়ার ফলে ডাকু চলার ক্ষমতা হারায়। তাই

এই বেকার স্বামীকে নিয়ে যৌবনবতী ময়না এই বস্তিতে এসে উপস্থিত হয় এবং দুজনে দু'রকম কর্মের সঙ্গে যুক্ত হয়।

পটলডাঙ্গার বস্তি অঞ্চলের মানুষজন অপরাধ জগতের সাথে যুক্ত থাকলেও তাদের মধ্যে মায়া-মমতা, স্নেহ এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনুভূতিগুলি মরে যায়নি। যার প্রমাণ পায় পটলডাঙার চতুর্থ 'মন্থশেষ' গল্পে বাঞ্ছারামের চুরি করা বাচ্চাটিকে দেখে বিন্দির মনের মধ্যে এক অদ্ভুত ক্ষিদের অনুভব হয়- **"খেঁদির ঘরে ছেলেটিকে দেখে দেখা অবধি বিন্দির বুকের মধ্যে অত্যন্ত মরচে পরা কোন একটা তারে কেবলই কম্পন উঠছিল। তাতে তার নিজেরই থেকে থেকে অবাক লাগছিল। পেটের ক্ষিদে সারা গায়ে ক্ষিদে ক্ষিদে এসবের অনুভূতি তার অজানা ছিল না, সে ক্ষিদের পথও জানা ছিল, কিন্তু বুকের ঠিক মাঝখানটাতে কিসের এ ক্ষিদে! এ একদম নতুন! ঘরে এসে ছেলেটাকে বুকে চেপে চুমোয় তার দুগাল ভরিতে দিয়েও তার তৃপ্তি হচ্ছিল না। মনে হচ্ছিল আরো ..... আরো কিন্তু আশ মিটছিল না"।**

আবার পটলডাঙ্গার পঞ্চম 'মৃত্যুঞ্জয়' গল্পেও চঞ্চু ও একটি বোবা মেয়ের মধ্যে ভাই বোনের মায়া-মমতা, স্নেহ পরিলক্ষিত। আসলে এই অন্ধকার জগতে আবদ্ধ মানুষরা ক্ষণিক আলোকের দিশা পেলেই সেই আলোকে আঁকড়ে ধরতে চায়, তাই হয়তো এই অজানা অচেনা বোবা মেয়েটিকে আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চেয়েছে চঞ্চু। আর তার জন্যই এই বস্তি ছাড়তে সে একবারও ভাবেনি।

শারীরিক বা মানসিক সব প্রতিবন্ধকতায় সমাজের সঙ্গে যুক্ত। আসলে আমাদের সমাজও একটি প্রতিবন্ধী। মনীষ ঘটক এই গল্পগ্রন্থের মধ্য দিয়ে সমাজ প্রতিবন্ধকতার দিকে আলোকপাত করেছে।

নীরজা: 'মালঞ্চ'(১৩৪০বঙ্গাব্দ): রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

'মালঞ্চ' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপন্যাস। 'বিচিত্রা' মাসিক পত্রে ১৩৪০ বঙ্গাব্দের আশ্বিন থেকে অগ্রহায়ণ পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে প্রথম প্রকাশ শেষ জীবনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দুটি পরকীয়া বিষয়ক উপন্যাস রচনা করেছিলেন। একটি 'দুই বোন' মিলনান্তক উপন্যাস, অপরটি 'মালঞ্চ' বিয়োগান্তক উপন্যাস।

'মালঞ্চ' আক্ষরিক অর্থে উদ্যান, যা নিঃসন্তান দম্পতির প্রতি মনোনিবেশ করে যারা পুরো জীবন তাদের বাগানের চারপাশে ঘুরে বেড়ায়।

গর্ভপাতের কারণে নীরজা শয্যাশায়ী হওয়ার পরে তার স্বামী আদিত্যের এক দুঃসম্পর্কের ভাই এবং বন্ধু সরলা তাদের জীবনে প্রবেশ করেছিল। অসুস্থ নীরজা সন্দেহ করে যে সরলা আদিত্যর হৃদয়ে এবং তার বাগানে তার অবস্থান দখল করতে চায়। এবং তাদের স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের ফাটল ধরে।

নীরজা তার সন্দেহে গড়ে তোলা ফুলের তথা সংসার জীবনের বাগানে অন্য কোনো আগন্তুকের অনুপ্রবেশ মেনে নিতে পারেনি। হয়তো সে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তার ব্যক্তিগত জীবন আর ঠিক করতে পারেনি। এই উপন্যাসটিকে ত্রিভুজ প্রেম বা ত্রিকোণ প্রেমের উপন্যাস বলা চলে। মৃত্যুশয্যায় শায়িত নীরজা তার স্বামীর উপর অধিকার রক্ষার অসহায় সংগ্রাম, স্বামীর প্রতি তার অনুদার সন্দেহ, ফুল বাগানের ওপর কৃতিত্ব প্রতিষ্ঠার আগ্রহ এবং ট্রাজিক পরিণতি অঙ্কন এই উপন্যাসের মূল বিষয়।

উপন্যাসের শেষ পরিণতিতে দাম্পত্য সম্পর্কের টানাপোড়নের চিত্র ফুটে উঠেছে। শেষ পর্যন্ত নীরজার দাম্পত্য কলহ সহ্য করতে না পেরে মারা যায়। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'মালঞ্চ' উপন্যাসে পরকীয়া সম্পর্কের ছবি তুলে ধরলেও শেষ পর্যন্ত মিলন ঘটেনি। 'মালঞ্চ' উপন্যাসে অসুস্থ নীরজার মনস্তত্ত্ব রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে এঁকেছেন।

রাধারানী: রাধারানী(১৮৭৫): বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের একটি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস হলো রাধারানী ১৮৭৫ সালে বঙ্গদর্শন পত্রিকায় এই উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়েছিল। এই উপন্যাসের মূল বিষয়বস্তুতে একটি কিশোরী মেয়ের লড়াইয়ের কথা রয়েছে। রথযাত্রার মেলায় হারিয়ে যাওয়া এক কিশোরীর কাহিনী। এই উপন্যাসে রাধারানীর পারিবারিক পরিচয় হিসেবে পাই, সে পিতৃহারা। বড়ো ঘরের মেয়ে হওয়া সত্ত্বেও একটি মামলার কারণে তাঁর বিধবা মা সর্বস্বান্ত হয়। দশ লক্ষ টাকার সম্পত্তি কেড়ে নেয় এবং তাঁদের গৃহচ্যুত করে। তখন রাধারানীর মা কায়িক শ্রম করে কিছু উপার্জন করতেন। তা দিয়েই সংসার চলতো কিন্তু শরীর খারাপ হওয়ার আর সেই কাজ করতে পারছিলেন না তিনি। ফলে খাবার জুট ছিল না কারোরই। রথের দিন তাঁর অবস্থা আরো খারাপ হওয়ার পথের প্রয়োজনে রাধানারী বনফুলের মালা বিক্রির জন্য রথের মেলায় যায়। রথের মেলায় হঠাৎ বৃষ্টি নেমে আসলে মেলা ভেঙে যায়। রাধারানীর ফুলের মালা আর বিক্রি হয় না। সে তখন কাঁদতে কাঁদতে বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হয়। অন্ধকারে কর্দমাক্ত পিচ্ছল রাস্তায় রাধারানীর হাঁটতে অসুবিধা হয়। তখন এক আগন্তুক ব্যক্তি এলেন যাকে দেখে রাধারানী ভয় পায়। সেই আগন্তুক ব্যক্তি রাধারানীকে অন্ধকারে হাত ধরে কর্দমাক্ত পথে বাড়ির দিকে নিয়ে যায় এবং তার ফুলের মালাটিও কিনে নেন, রাধারানী এমন মানুষের থেকে পয়সা নিতে কান্নাবোধ করলেও তার অসুস্থ মায়ের জন্য পাথ্যের কথা ভেবে পয়সা নিতে প্রস্তুত হয়। অন্ধকারে রাধারানীর মনে হয় যে আগন্তুক তাকে বেশি পয়সা দিয়েছেন এবং রাধারানীর সন্দেহ হয় যে আগন্তুক তাকে বেশি পয়সা দিয়েছেন এবং রাধারানীর সন্দেহ হয় যে সেটি পয়সা নয়, চকচকে টাকা। তখন সে আগন্তুককে

বাইরে অপেক্ষা করতে বলে ভিতরে যায় সেটি টাকা না পয়সা আলো জ্বালিয়ে পরীক্ষা করে দেখতে। সে দেখে আগন্তুক সত্যিই বেশি টাকা দিয়েছে, রাধারানী বাইরে বেরিয়ে এসে দেখে আগন্তুক নেই।

"পুনরায় তাঁর মা এই ঘটনা শুনে যখন বলেন ..... সে দাতা, আমাদের দুঃখ শুনিয়া দান করিয়াছে আমারও ভিখারি হইয়াছি, দান গ্রহণ করিয়া খরচ করি"

উপন্যাসের এই অংশ থেকে বোঝা যায় রাধারানী মানসিক প্রতিবন্ধতার শিকার, মানসিক টানাপোড়নের মধ্যেও সে তার অসুস্থ মাকে নিয়ে লড়াই করে চলেছে।

আবার দেখা যায়, পদ্মলোচন নামে এক কাপড় দোকানির হাতে সেই আগন্তুক একটি শাড়ি কিনে পাঠায়। আগন্তুকের দেওয়া টাকা দিয়ে মায়ের পথ্য নিয়ে আসে।

রাধারানী ঘর পরিষ্কার করতে গেলে একটা নোট কড়িয়ে পায় –

"এই নোটটিতে যে ব্যাক্তি এটা দিয়েছেন তার নাম লেখা ছিল রুক্মিণী কুমার রায়"

সেই নোটটি তাঁর সযত্নে রেখে দেয়। লেখক তাই লিখেছেন- **"তাহারা দরিদ্র, কিন্তু লোভী নহে"।**

উপন্যাসের সবশেষে দেখা যায়, রাধারানী ও রুক্মিণী কুমার অর্থাৎ যার আসল নাম দেবেন্দ্র নারায়ণ রায়, পরস্পর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। উপন্যাসের রাধারানী চরিত্রটিকে আমরা মানসিক প্রতিবন্ধী হিসেবে তুলে ধরতে পারি। যদিও উপন্যাসের শেষে রাধারানী তার মানসিক প্রতিবন্ধীকতা কাটিয়ে উঠতে পেরেছিল এবং সুস্থ ও স্বাভাবিকভাবে জীবনযাপন করেছিল।

পঞ্চম অধ্যায়

সমাজের প্রতিবন্ধকতাঃ প্রতিবন্ধী সমাজ

আমাদের আশে পাশে এরকম অনেক শিশু দেখা যায়, যারা স্বাভাবিক শিশুদের মত হয় না। তাদের আচার-আচরণ ও দৈহিক গঠন স্বাভাবিকের তুলনায় ধীর এবং অসামঞ্জস্যপূর্ণ, সমস্যা গ্রস্ত। এদের মধ্যে অনেকেই আছে যারা ভালোভাবে চোখে দেখতে পায় না। আবার কারও কারও হাঁটাচলা করতে অসুবিধে।

কিছু শিশু আছে যারা ঠিক মত কথা বলতে পারে না। আবার অনেকেই আছে যারা অন্যের কথা শুনতে পায় না। আবার কেউ কেউ আছে বুদ্ধি প্রতিবন্ধী যারা অনেক বড় হয়েও ছোটদের মতো আচরণ করতে থাকে। তারা একা একা দিনাতিপাত করে। বুদ্ধি প্রতিবন্ধী হওয়ায় তাদের সাথে মিশতে চায় না, খেলে না, এমনকি কেউ তাদের সাথে কথা বলতে চায় না।

- প্রথমত, এদের প্রতিবন্ধকতার প্রধান কারণ হলো পরিবার। যে কোনো মানুষের সামাজিক অবস্থান তৈরি হয় পরিবার থেকে। কিন্তু এই পরিবারই অনেক সময় প্রতিকূলতা সৃষ্টি করে।
- সমাজে বিকশিত হওয়ার দ্বিতীয় প্রতিবন্ধকতা হলো সমাজ। কারণ সামাজিক ধ্যান ধারণার উপর নির্ভর করে এইসব শিশুদের ভবিষ্যৎ। আর সমাজই যদি তাদের স্বাভাবিক ভাবে গ্রহণ না করে, তাহলে এ ধরনের মানুষের জীবনে আরো বড় ধরনের বিপর্যয় নেমে আসবে।
- সমবয়সীরা আরেকটা প্রতিবন্ধকতা। দেখা যায়, সমবয়সীরা তাদের সাথে মিশতে চায় না। তাদের সাথে কথা বলতে চায় না, সবসময় তাদের থেকে দূরে থাকে, তাদের সাথে মিশতে চায় না, এটিই তাদের বেড়ে ওঠার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধকতা।
- বৈষম্য ও কুসংস্কার হলো বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের সমাজে বিকশিত হওয়ার ক্ষেত্রে অন্যতম প্রতিবন্ধকতা। সমাজের সর্বস্তরে এরূপ একটি বিশ্বাস আছে যে, প্রতিবন্ধীত্ব একটি অভিশাপ এবং একটি পাপ কাজের শাস্তি। এরূপ বিশ্বাস বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের সমাজে বিকশিত হতে বাধা সৃষ্টি করে।

সমাজে প্রতিবন্ধীদের অবস্থান অত্যন্ত অবহেলিত। পরিবার থেকে শুরু করে সব স্থানেই প্রতিবন্ধীদের কে খাটো করে দেখা হয়। আর দশজন স্বাভাবিক মানুষের মতো প্রতিবন্ধীদের সামাজিক সব অধিকার ভোগ করার থাকলেও বরাবরই তারা তা থেকে বঞ্চিত। আত্মীয়-স্বজন সামাজিক মান

মর্যাদার ভয়ও তাদের দূরে সরিয়ে রাখেন, সমাজে তাদের অবাধ চলাচল বাধাগ্রস্ত হয়। শিক্ষা, চাকরি, কর্মস্থান, বিয়ে, স্বাস্থ্যসেবা প্রভৃতি ক্ষেত্রে তারা বৈষম্যের শিকার হয়। বিভিন্ন ধরনের বৈষম্যের শিকার হয়ে তারা সমাজে নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করতে পারে না। যেকোনো মানুষের সামাজিক অবস্থান তৈরি হয় পরিবার থেকেই। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে একথা আরোও বেশি প্রযোজ্য। দরিদ্র পরিবারগুলোতে প্রতিবন্ধীদের অবস্থা আরোও করুন, অনেক সময় তাদের অনাহারে অর্ধাহারে থেকে দিন পার করতে হয়। অধিকাংশ পরিবারেই প্রতিবন্ধীদের বোঝা হিসেবে গণ্য করা হয়। আমরা অনেক ক্ষেত্রেই প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে তার প্রতিবন্ধকতার জন্য দায়ী করে থাকি। শুধু ব্যক্তিকে নয়, ব্যক্তির পরিবার বা স্বজনরাও এই অপবাদ থেকে রেহাই পায় না। সমাজে ওই পরিবারের সদস্যদের কটুকথা শুনতে হয়। কিন্তু বাস্তবতা হলো প্রতিবন্ধীতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করলেও ব্যক্তি কখনোই এর দায়ভার নিয়ে সারা জীবন কলঙ্কিত হতে পারে না। অনেক ক্ষেত্রে অনেক কুসংস্কারচ্ছন্ন মনোভাব ও প্রতিবন্ধকতাকে বোঝার ক্ষেত্রে সঠিক দিকনির্দেশনা প্রদান করতে পারে না। ধর্মের অপব্যাখ্যা, অবৈজ্ঞানিক চিন্তাভাবনা, পুরানো ধ্যান-ধারণা, অবিবেচনা প্রস্তুত সিদ্ধান্ত প্রতিবন্ধকতার জন্য ধরা হয়ে থাকে, কৃতকর্মের ফল হিসাবে উত্তরাধিকার সূত্রে, পাপ বা অভিশাপ ইত্যাদি বিভিন্ন আঙ্গিকে প্রতিবন্ধীতাকে সমাজ অপব্যাখ্যা দিয়ে থাকে।

প্রতিবন্ধীতা কখনো সংক্রমক কোন রোগ নয়, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি বা পরিবার ঘনিষ্ঠ হলেও তা অন্যের মধ্যে সংক্রমিত হওয়ার কোনো সম্ভাবনা থাকে না, তারা অন্য কোন গ্রহের কোন জীব নয় একথা সবার প্রথমে আমাদের মনে রাখতে হবে। অনেক প্রতিবন্ধী এই সমাজে আছে যারা মানসিক ভাবে দুর্বল হলেও শারীরিক দিক দিয়ে অনেক বেশি সক্ষম। তাদের এই সক্ষমতা ও ভালো কাজগুলো সমাজ দেখে না লোক লজ্জার ভয়ে। তাদেরকে এই ভালো কাজের সক্ষমতা কে কাজে লাগিয়ে আশ্বাস দেওয়া দরকার, সমাজের প্রতিটি মানুষের উচিত তাদের পাশে থাকা, তাদের মনের কথা বোঝা, তাদের সঙ্গে মেলামেশা করা, এছাড়াও তাদের প্রতি মনোযোগ দেওয়া উচিত এবং তাদের পাশে থেকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া প্রতিটি মানুষের কর্তব্য।

প্রতিবন্ধী মানুষের প্রতি সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন মনুষ্যত্বের সর্বোত্তম কর্ম রূপে বিবেচিত হয়। সকল যুগে সকল মনীষীরা এই দায়িত্বকে মনুষ্যত্বের প্রবিত্র কর্তব্য রূপে উল্লেখ করেছেন। বাংলার বুকে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর থেকে শুরু করে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় কিংবা কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সকলেই প্রতিবন্ধী মানুষকে নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী সাহায্যের কথা বলে গিয়েছেন। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন,-

“জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর”

ভারতবর্ষের এই যুবক ঋষির জীব সেবার মহান বাণীকে পাথেয় করে প্রতিবন্ধী মানুষকে নিজেদের মন থেকে সেবা ও তাদের যত্ন নেওয়া সমাজের সকল মানুষের কর্তব্য। তাহলে সমাজের মানুষগুলোর থেকে সেবায় ও সাহায্যে তারা নিজেদের প্রতিবন্ধকতাকে জয় করে আপন প্রতিভার দ্বারা সমাজে কোন না কোন অবদান রেখে যেতে সক্ষম হয়।

বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুরা সমাজের ৮-১০টা সাধারণ শিশুর মতো স্বাভাবিক হয় না। তাদের আচরণ কিংবা চলাফেরায় এক বিশেষ পার্থক্য থাকে, বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুরা সমাজে তাদের অপূর্ণতার কারণে অনেক প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়। পৃথিবীর এক নিষ্ঠুরতার ভাগী তারা, এদের শারীরিক অসুস্থতা কিংবা মানসিক সমস্যা থাকার কারণে তাদের বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশু বলা হয়ে থাকে।

আমাদের সমাজে অনেক বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুরা রয়েছে, যারা সমাজে নিজেদের বিকশিত করতে পারে না। অথচ তাদেরও সুস্থভাবে বাঁচার অধিকার আছে, তাদেরও মৌলিক অধিকার রয়েছে। কিন্তু আমাদের সমাজে তাদের সে মর্যাদা দেওয়া হয় না। বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের সমাজে হেয় চোখে দেখা হয়। সমাজ তাদের কোনো সুযোগ সুবিধাই দেয় না, বরং তাদের তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে। সমাজের নিষ্ঠুর কিছু মানুষের জন্য প্রতিবন্ধী শিশুরা তাদের নিজেদের বিকশিত করা থেকে বঞ্চিত হয়। তারা যখন নিজে থেকে তাদের প্রতিভা বিকশিত করতে চায় তখন তাদের বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয়। বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের বিকশিত করতে না পারার বিশেষ কিছু প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। তাদের মধ্যে 'কুসংস্কার' ও 'বৈষম্য' অন্যতম। যখন একজন প্রতিবন্ধী শিশু নিজেকে বিকশিত করতে চায় তখন সমাজ তাকে বুঝিয়ে দেয়, সে চাইলেই সব কাজ সাধারণ শিশুর মতো করতে পারে না। বৈষম্যের কারণে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুরা তাদের কাজগুলো ঠিক ভাবে করতে পারে না। এই প্রতিবন্ধকতা তাদের জীবনে প্রভাব ফেলে, তারা নিজেদেরকে বোঝা ভাবতে শুরু করে এবং পরবর্তী সময়ে আর কাজ করার অনুপ্রেরণা পায় না।

আবার অনেক পরিবার আছে, যারা লোকলজ্জায় কিংবা সমাজের ভয়ে অনেক সময় বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন যে তালিকা রয়েছে, তাতে অন্তর্ভুক্ত করেন না। বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুরা বাকি সাধারণ শিশুদের মতো বেড়ে ওঠে না। তাদের আচরণ কিংবা চলাফেরা স্বাভাবিক নয়। তাই তাদের পড়তে হয় নানাবিধ সমস্যায়। প্রতিবন্ধকতা তাদের জীবনকে গ্রাস করে ফেলে। তাদের দৈহিক গঠন, আচরণ অসাম্যঞ্জপূর্ণ হওয়ায় তাদের অনেক প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হচ্ছে প্রতিনিয়ত।

বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের বিভিন্ন ধরন রয়েছে। এর মধ্যে কেউ কেউ ঠিকভাবে হাঁটাচলা করতে পারে না, অনেকে আবার ভালোভাবে কথা বলতে পারে না, কেউবা কানে শুনতে পায় না,

আবার অনেকে আছে চোখে দেখতে পায় না, অনেকে আবার বুদ্ধি প্রতিবন্ধী, সমাজে তাদের বোঝা মনে করা হয়। অনেকে বিশ্বাস করেন এটি কোনো পাপের শাস্তি বা অভিশাপ।

পরিবার থেকে শুরু হয় বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের প্রতিবন্ধকতা। একটা পরিবারের উচিত তার বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুর প্রতি যত্নশীল হওয়া। কিন্তু তা না হয়ে পরিবার প্রতিবন্ধী শিশুকে তাদের পরিবারের বোঝা ভাবতে শুরু করে, এমন অনেক পরিবার আছে যারা জানেই না তাদের ঘরে থাকা প্রতিবন্ধী শিশুটির চাহিদা। তারা অনেকেই বুঝতে পারে না তাদের কি দরকার এবং কি সুযোগ দেয়া উচিত। যার ফলে শিশুরা নিজেকে বিকশিত করার সুযোগ পায় না, কিন্তু পরিবারই পারে এই প্রতিবন্ধকতাকে দূরে ঠেলে দিতে, তার শিশুর সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক করতে এবং তার কি চাহিদা আছে তা জেনে সে অনুযায়ী তার সন্তানকে গড়ে তুলতে।

প্রতিবন্ধী শিশুদের জীবনযাত্রার মান ফিরিয়ে দিতে পারে তাদের অধিকার সমূহ। আমাদের কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য আছে তাদের উপর, যা কার্যকর করতে হবে তাদের নিজেদের বিকশিত করার জন্য। তাদের চলার পথে বাড়তি সুযোগ সুবিধা দেয়া উচিত, তাদের জন্য আলাদা বিদ্যালয় গড়ে তোলা উচিত, দরকার আলাদা কর্মক্ষেত্র যেখানে তাদের জন্য বিভিন্ন সুযোগ দেওয়া থাকবে।

প্রতিবন্ধী মানুষের জন্য অন্যতম প্রতিবন্ধকতা হলো সমাজ। সমাজের মানুষ তাদের কে হেয় চোখে দেখে, সমবয়সীরা তাদের সাথে মিশতে চায় না, কিন্তু একটা প্রতিবন্ধী শিশুর ভবিষ্যৎ নির্ভর করে সমাজের ধ্যান ধারণার উপর। সমাজের মানুষ বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের অযোগ্য ভাবার কারণে তারা বিভিন্ন রকম হেনস্তার সম্মুখীন হয়। তবে সমাজের মানুষদের উচিত তাদের ওইসব প্রতিবন্ধকতায় না ফেলে তারা যে কাজে পারদর্শী সে কাজ করতে দেওয়া, তাদের মৌলিক চাহিদাগুলো বুঝিয়ে দেওয়া, সমাজের বোঝা না ভেবে তাদেরকে মানুষ ভাবা উচিত।

জাতিসংঘের এক প্রতিবেদন অনুযায়ী, স্বাভাবিক শিশুর তুলনায় বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের অন্যায়ের শিকার হওয়ার আশঙ্কা চারগুণ বেশি থাকে। অথচ স্বাভাবিক ভাবে জীবন যাপন করতে পারা তাদের মৌলিক অধিকার, প্রতিবন্ধী শিশুদের প্রতি করুণা না করে তাদের জন্য ইতিবাচক মনোভাব নিয়ে বিভিন্নভাবে সাহায্যে এগিয়ে আসা উচিত। সমাজের মানুষের বোঝা উচিত যে প্রতিবন্ধীরা অক্ষম নয়, তারাও কোনো না কোনো কাজে সক্ষম।

সুস্থ শিশু জাতির ভবিষ্যৎ, শিশু যদি প্রতিবন্ধী হয় তাহলে তাকে নিয়ে পরিবারের মানুষের অনেক চিন্তা থাকে। যেখানে শিশুদের মধ্যে সামাজিক যোগাযোগ, সামাজিক আচরণ, সামাজিক কল্পনা ইত্যাদি ক্ষেত্রসমূহে বেশ সমস্যা লক্ষ্য করা যায়। যদিও সঠিক চিকিৎসা নিয়ে এইসব শিশুকে সুস্থ করে তোলা যায়। প্রতিবন্ধী শিশুদের সুস্থ রাখতে তাদের সঙ্গে সমাজ এবং পরিবারের একটি সুন্দর সম্পর্ক

গড়ে তোলা খুব গুরুত্বপূর্ণ। সমাজের পরিবারের প্রতিটা মানুষের উচিত তাদের সঙ্গে পারস্পরিক সম্পর্ক গড়ে তোলা।

ষষ্ঠ অধ্যায়

আইনী অনুশাসনে প্রতিবন্ধী চরিত্র

প্রতিবন্ধী চরিত্র আলোচনা আইনের অনুশাসন উল্লেখের কারণ সমাজ ইন্দ্রীয় বিকল মানুষদের স্বীকৃতি জানাচ্ছে। প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষদের সাম্য ও অধিকারের কথা বলেছে। সাহিত্য ক্ষেত্রে যুগ প্রেক্ষিতে এই অধিকার ভিন্নতার ছবি বিভিন্নভাবে থাকলেও সময় যত অগ্রসর হয়েছে প্রতিবন্ধকতার প্রতি সংকীর্ণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে প্রতিবন্ধকতাসম্পন্ন মানুষরা সমাজের চোখে উপহাস্য করুণার পাত্র হয়েছে।

প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বিশ্ব প্রেক্ষাপটে অক্ষমদের প্রতি রাষ্ট্রের ইতিবাচক মনোভাবের উদাহরণ সহ বেশ কয়েকটি পাওয়া যায়। খ্রিঃপূঃ ১৯৫২ অব্দের ক্ষীরস এর প্রাপ্ত চিকিৎসা শাস্ত্রের পান্ডুলিপি, দ্বাদশ শতকেই ইংল্যান্ডের রাজা দ্বিতীয় হেনরি কর্তৃক মানসিক প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষদের জন্য বিশেষ আইন প্রণয়ন। ১৩৩০ খ্রিঃ রাজা তৃতীয় এডওয়ার্ডের বেথেল হেম হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা পঙ্গু লোকেদের বিশেষভাবে সাহায্যদানের বিধানপ্রদান। সপ্তদশ শতাব্দীতে চার্চ কর্তৃক অক্ষম মানুষদের দায়িত্ব গ্রহণ সবই রাষ্ট্র কর্তৃক প্রতিবন্ধী মানুষদের প্রতি বিশেষ ইতিবাচক ব্যবস্থা গ্রহণেই দৃষ্টান্ত।

অক্ষম, দুর্বল প্রতিবন্ধী সব মানুষরাই সমাজের অঙ্গ, তাই সমাজের সার্বিক উন্নতির জন্য সমস্ত মানুষদের সুবিধা-অসুবিধা দেখা রাষ্ট্রের নৈতিক কর্তব্য। প্রথম পর্যায়ে 'Instirctive Darwinism' এর যুগে মানুষ প্রতিবন্ধকতাকে ভগবানের দেওয়া শাস্তি মনে করত। ফলে তখন তারা 'sin the ary'র উপর ভিত্তি করে অক্ষমদের সমাজ থেকে বিতাড়িত করত। এই Social Darwinism' এর পর্যায় থেকে আধুনিক যুগে অনেকটাই বেরিয়ে এসে এখন অক্ষম মানুষদের পুনর্বাসনের মাধ্যমে সবাইকে নিয়ে মিলিতভাবে সুন্দর সমাজ গঠনের প্রয়াসে ব্রতী হয়েছে।

ভারত প্রতিবন্ধীতার সুবিধা ভারতে অক্ষমতার সুবিধাঃ-

সর্বোচ্চ ২০১১ সংখ্যার ফলাফল, জনসংখ্যার প্রায় 2.21 শতাংশ (তত্ত্বকালীন সময়ে ১২১ সংখ্যা সেনসাস সংখ্যার মধ্যে প্রায় 2.6 কোটি) এক নম্বরে অক্ষম আছে। প্রতিবন্ধীদের সহায়তা বা বন্ধকতা দূরীকরণের দিক এবং প্রতিবন্ধীদের মূলধারার ব্যবস্থার প্রতি ক্রিয়াকলাপ অংশ নেওয়ার কারণ হিসাবে সুবিধা দেওয়া হয়।

কিছু সুবিধা এখানে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে:-

i) অন্ধ বা অন্ধ অর্থোপেডিক প্রতিবন্ধী সমস্ত সরকারি বেহস্তদের প্রতি আশার প্রতিসাপে INR INR দিক বেতন ৫% যানবাহন সরবরাহ করা হয়।

ii) প্রতিবন্ধী শিশুর যত্নের জন্য এবং প্রতিবন্ধী ভাতার জন্য শিক্ষা ভাতা। উৎসাহ প্রতিবন্ধী মহিলাদের জন্য প্রতি টাকা প্রদান করা হবে শিশুর যত্নের জন্য বিশেষ ভাতা হিসেবে প্রতি মাসে ১০০০/- টাকা, এই ভাতার সন্তানের জন্মের সময় থেকে সন্তানের দুই বছর বয়স পর্যন্ত প্রদান করতে হবে।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য প্রায়শই বৃত্তিপ্রদান করা হয়। সরকারি অফিস সংরক্ষণ করা হয়, কৃত্রিম সহায়তা এবং ডিভাইসগুলিকে ভর্তুকি দেওয়া যেতে পারে। ব্যবসা শুরু করার জন্য নিম্ন স্বল্প সুদেনাগুলি থেকে পাওয়া যেতে পারে। প্রকল্পগুলি কিছু যোগ করতে পারে, এবং যানবাহনের পোর্টাল কম দামে করা যেতে পারে। সাধারণত এই প্রকল্পগুলি এবং সেগুলিকে যেমন প্রচার করা হয় এবং বিকল্পগুলি প্রতিবন্ধী সে গ্রহণ করতে পারে।

প্রতিবন্ধকতা আইনঃ- ১৯৯৬ সালে(১৯৯৬ এর গেজেট নম্বর ১) তৈরি প্রতিবন্ধকতা আইনের উদ্দেশ্য হল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পরিষেবা প্রদান। সুবিধা তৈরি এবং তাদের উৎপাদন ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ এবং দেশের নাগরিক হিসাবে অন্যদেরসঙ্গে সমানভাবে সক্রিয় করার লক্ষ্যে কেন্দ্র এবং রাজ্যের দায়িত্ব নির্দিষ্ট করা। প্রতিবন্ধকতা যাতে তাঁর স্বাভাবিক জীবনযাপনের ক্ষেত্রে বাধা না হয়ে দাঁড়ায় এবং দেশের একজন নাগরিকের মতোই তিনি যাতে তাঁর ক্ষমতা অনুযায়ী স্বাভাবিক অবদান রাখতে পারেন। সেজন্য সরকারের (কেন্দ্র এবং রাজ্য) দায়িত্ব নির্দিষ্ট করে দিয়েছে প্রতিবন্ধকতা আইনী। ১৯৯৫ সালের এই আইন প্রতিবন্ধী মানুষদের শিক্ষা-জীবিকা এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা যেগুলি নিশ্চিত করা হয়। সেগুলি হল-

শিক্ষাক্ষেত্রেঃ-

i. ১৮ বছর পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষার ব্যবস্থা।
ii. স্কুলছুটদের চিহ্নিত করে বিদ্যালয়মুখী করার প্রচেষ্টা।
iii. শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের বিশেষ ব্যবস্থা।
iv. প্রতিবন্ধী শিশুদের স্কুলে যাতায়াতের ব্যাপারে বিশেষ সহায়তা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ।

জীবিকাক্ষেত্রেঃ-

i. চাকুরিক্ষেত্রে ৩০% পদ প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষণ করা এবং তার মধ্যে আবার ১% সম্পূর্ণ দৃষ্টিহীন-আংশিক দৃষ্টিহীন, শ্রবণ ক্ষমতাহীন অথবা সেরিব্রাল পালসি আক্রান্ত মানুষদের জন্য সংরক্ষিত করা।

ii. বিশেষভাবে সক্ষম এই সমস্ত মানুষদের জন্য বিশেষ কর্মবিনিয়োগ কেন্দ্র স্থাপন।

iii. নিয়োগকারী সংস্থাগুলির এই সমস্ত মানুষদের উপর বিশেষ নজরদারি।

অন্যান্যক্ষেত্রেঃ-

i. প্রতিবন্ধকতা পেরিয়ে যাবার জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম সরকার কর্তৃক প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ।

ii. সরকারি চাকরি এবং পদোন্নতিতে সব বৈষম্য দূরীকরণ।

iii.স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় সহ বিভিন্ন উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং পেশাগত শিক্ষার দক্ষ প্রতিষ্ঠান গুলিতে প্রতিবন্ধকতা প্রতিরোধ, পুনর্বাসন নিশ্চিত করা, সর্ববিধ সহায়তা প্রদান এবং গবেষণায় যাবতীয় সাহায্য নিশ্চিত করন।

iv.সরকার কর্তৃক ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা ১৯৯৬ সালের ১ জানুয়ারি ভারত সরকার প্রতিবন্ধী ব্যক্তি (সমান সুযোগ, অধিকারের সুরক্ষা এবং সম্পূর্ণ অংশগ্রহণ আইন ১৯৯৫ পাস করে। ১৮ বছরের কমবয়সী শিশুদের সঙ্গে সম্পর্কিত এই আইনের বিভিন্ন দিকের রূপরেখা নীচে বর্ণিত হয়েছে। এই আইনে প্রতিবন্ধকতা বলতে অন্ধত্ব, কম দেখতে পাওয়া, কুষ্ঠরোগ থেকে সুস্থ হয়ে ওঠা, কানে কম শোনা, ঠিকমতো হাঁটাচলা করতে না পারা, জড়বুদ্ধি, মানসিক অসুস্থতাকে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই আইন সরকারকে প্রতিবন্ধকতা প্রতিরোধ করতে যথাযথ পদক্ষেপ করতে বলে। সেই লক্ষ্যে সরকার অবশ্যই বছরের অন্তত একবার প্রতিটি শিশুর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে তাদের প্রতিবন্ধকতার সম্ভাবনার বিচার করবে এবং তা প্রতিরোধ করার চেষ্টা করবে। সন্তান জন্মানোর আগে ও পরে মা ও শিশুর স্বাস্থ্যের যেকোন রকম সম্ভাবনা কমানোর চেষ্টা করবে রাষ্ট্র।

প্রতিবন্ধীদের আর কত অবহেলাঃ-

প্রত্যেক বছরের মত এবারেও ৩ ডিসেম্বর পালিত হল আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস। সারা বিশ্বের সঙ্গে এ রাজ্যে দিনটি উদযাপিত হল। কিন্তু উৎসব উদযাপন পেরিয়ে থেকে যায় সেই চিরন্তন প্রশ্ন, গত বছরের মতো এবারেও ২০১৬ সালের প্রতিবন্ধী মানুষ অধিকার আইনের বাস্তবায়নের দাবি নিয়ে

পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের প্রতিবন্ধকতার অধিকার সম্পর্কিত সংগঠন ও বেশ কিছু স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন একাধিক মিটিং মিছিলের আয়োজন করে। উল্লেখ করতেই হয় সারা দেশের মধ্যে বৃহত্তম সমাবেশটি দেখা গিয়েছিল কলকাতার রাজপথে। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য প্রতিবন্ধী সম্মেলনের উদ্যোগে গত ২৫ বছর ধরে এই উদ্যোগ চলে আসছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও না বলে উপায় নেই, পশ্চিমবঙ্গ ও ভারতের প্রতিবন্ধকতা বিষয়ক ভাবনা ডিসেম্বর মাসের প্রথম কয়েক দিনেই সীমাবদ্ধ থাকে।

আজও পশ্চিমবঙ্গে বাস, ট্রাম, ট্রেন বা পরিবহনের এমন কোন মাধ্যম নেই, যেখানে একজন হুইলচেয়ার ব্যবহারকারী অনায়াসে যাতায়াতের সুযোগ লাভ করতে পারেন, এবং নিজেকে অন্যদের সমান মনে করতে পারেন। প্রতিবন্ধী মানুষদের পক্ষে উপযুক্ত কর্মসংস্থানের বাতাবরণ তৈরি করে তাদের অধিকার রক্ষার তেমন প্রয়াস এখনও পর্যন্ত দেখা গেল না। অথচ সমান সুযোগ সম্পূর্ণ অংশগ্রহণ এবং অধিকার রক্ষার বিষয়গুলি তো ১৯৯৫ সালের প্রতিবন্ধকতা আইনেই উল্লেখিত ছিল। একীভূত সমাজ গঠনে আন্তর্জাতিক অঙ্গীকারের ফলে প্রতিবন্ধী শিশু ও তাদের পরিবারগুলোর অবস্থা কিছুটা উন্নতি হয়েছে। কিন্তু তাদের মধ্যে অনেকের তাদের এলাকার নাগরিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে অংশ নেওয়ার ক্ষেত্রে বাধার সম্মুখীন হচ্ছে। একীভূতকরনের মাধ্যমে সমতার অঙ্গীকার বাস্তবায়নে যেসব পদক্ষেপ নিতে হবে তা হলোঃ-

i. জাতিসংঘ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের অধিকার সনদ ও শিশু অধিকার সনদ অনুমোদন ও বাস্তবায়ন করতে হবে।
ii. একীভূতকরণের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতাগুলো দূর করতে হবে যেন পরিবেশ শিশুবান্ধব হয়। যেমন বিদ্যালয়, স্বাস্থ্যসেবা, জনপরিবহন প্রভৃতি ক্ষেত্রে প্রবেশগম্যতা সহজ হয় এবং প্রতিবন্ধী শিশুরা যেন সহপাঠী বা সমবয়সীদের মতো অংশগ্রহণে উৎসাহিত হয়।
iii. প্রতিবন্ধী শিশুদের প্রাতিষ্ঠানিকীকরন বন্ধ করতে হবে। শুরু করতে হবে নতুন কোন শিশুকে প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করার মাধ্যমে। এর জন্য পরিবারভিত্তিক সেবা ও কমিউনিটিভিত্তিক পুনর্বাসনের বিস্তার ঘটাতে হবে। এবং এসব ক্ষেত্রে সহায়তা ত্বরান্বিত করতে হবে।
iv. পরিবারগুলোকে সহায়তা করতে হবে যেন তারা প্রতিবন্ধী শিশুদের জীবনযাপনের জন্য বাড়তি খরচ মেটাতে পারে এবং আয়ের হারানো সুযোগ ফিরে পেতে পারে।
v. প্রতিবন্ধী শিশু ও তাদের পরিবারের চাহিদা পূরণের জন্য যেসব সহায়তা এবং সেবার পরিকল্পনা করা হয় সেগুলো মূল্যায়নে প্রতিবন্ধী শিশু ও কিশোর-কিশোরী সহ তাদের পরিবারের সদস্যদের সম্পৃক্ত করার মাধ্যম এর ন্যূনতম মানকে ছাড়িয়ে যেতে হবে।

vi. সব খাতের সেবা সমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে হবে যেন প্রতিবন্ধী শিশু, কিশোর-কিশোরী ও তাদের পরিবার যেসব চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয় সেগুলোকে পূর্ণমাত্রায় মোকাবিলা করা সম্ভব হয়।

উপসংহার

বাংলা কথাসাহিত্যে দিব্যাঙ্গ চরিত্রের অবস্থান অন্বেষণের প্রচেষ্টায় যে ক্ষুদ্র প্রকল্পকার্যটি গৃহীত হয়েছে তার প্রেক্ষিতে আমরা মূলত এমন কিছু গল্প, ছোটগল্প, উপন্যাস যাতে শারীরিক ও মানসিক দিব্যাঙ্গ চরিত্র রয়েছে। সেগুলির মধ্যে থেকে উপাদান সংগ্রহ করেছি। সমকালীন সময় অনুযায়ী আলোচ্য দিব্যাঙ্গ চরিত্ররা সমাজে কি অবদান রেখেছে আলোচনা প্রসঙ্গে পুরান মহাকাব্যে দিব্যাঙ্গ চরিত্রদের সমাজ কতটা নিরাপত্তা দিতে পেরেছে তাও আলোচনার চেষ্টা করেছি। সমাজের শিশু কিশোরদের দিব্যাঙ্গ চরিত্র সাপেক্ষে মতাদর্শ কিরূপ হওয়া উচিত, তা শিশু কিশোর সাহিত্যে কিরূপ প্রতিফলন তাও আলোচনা করেছি। দিব্যাঙ্গ চরিত্ররা সমাজের চোখে করুণার পাত্র হবার সাথে সাথে কতটা বিদ্রুপের পাত্র তাও আমরা আলোচনার চেষ্টা করেছি। বলা বাহুল্য, এই আলোচনা একটি ভূমিকা মাত্র। ভবিষ্যতে এই বিষয় নিয়ে একটি বিস্তৃত কাজ হতে পারে। আরো বিচিত্র দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করা যায়। এক্ষেত্রে স্বল্প পরিসরের জন্য অনুসন্ধানের আরও অনেক ক্ষেত্র রয়ে গেল। ভবিষ্যতে এ নিয়ে কাজ করার ইচ্ছে রইল।

গ্রন্থপঞ্জি

আকর গ্রন্থঃ-

১) ঘোষ বিজিত(সম্পাদনা)। নকশাল আন্দোলনের গল্প। পুনশ্চ। কলকাতা। জানুয়ারি ১৯৯৯। দ্বিতীয় সংস্করণ জানুয়ারি ২০০৮।

২) চট্টোপাধ্যায় বঙ্কিমচন্দ্র রজনী। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র প্রকাশনা ১৭৭। ঢাকা। প্রথম সংস্করণ তৃতীয় মুদ্রন। ফাল্গুন ১৪১৭।

৩) চট্টোপাধ্যায় বঙ্কিমচন্দ্র। রাধারানী। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ১৪৩/১। অপার সারকুলার রোড কলিকাতা। শ্রাবন। ১৩৪৭।

৪) ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ। মালঞ্চ। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় ২১০ নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রিট।

কলিকাতা প্রথম সংস্করণ (২১০০)। চৈত্র ১৩৪০ সাল।

৫) ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ। গল্পগুচ্ছ (অখণ্ড সংস্করণ)। বিশ্বভারতী ৬/৩ দ্বারকানাথ

ঠাকুর লেন। কলিকাতা। শ্রাবন। ১৩৩৩।

৬) বন্দ্যোপাধ্যায় মানিক। সরীসৃপ। গুরুদাস এন্ড গ্রন্থ ২০৩/১/১। কর্ণওয়ালিস স্ট্রিট। কলিকাতা।

৭) বন্দ্যোপাধ্যায় মানিক। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প। বেঙ্গল পাবলিশার্স (প্রাঃ) লিমিটেড। ' কলকাতা। ৫ম সংস্করণ। শ্রাবন। ১৩৫৭।

৮) বন্দ্যোপাধ্যায় মানিক। পটলডাঙার পাঁচালী। গেঞ্চ বা প্রেস কলিকাতা ১৩। ১ম সংস্করণ। ভাদ্র ১৩৬৩

৯) বন্দ্যোপাধ্যায় মানিক। মানিক রচনাবলী। দ্বিতীয় খণ্ড ৬৮-৬৯। প্যারীদাসরোড। বাংলা বাজার। ঢাকা ১১০০। বাংলাদেশ। ঐতিহ্য ২০০৫।

১০) বন্দ্যোপাধ্যায় মানিক। প্রাগৈতিহাসিক। বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড ১৪। বাঙ্কিমচাটুজ্জে স্ট্রিট। কলিকাতা-৭৩। প্রথম সংস্করণ। অগ্রহায়ণ ১৩৬৭।

১১) মৈত্র সমীর (সম্পাদনা)। লীলা মজুমদার রচনাবলী ১। এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি। কলেজ স্ট্রিট মার্কেট। কলিকাতা-৭। প্রথম প্রকাশ ১৩৬০ ।

১২) মৈত্র সমীর (সম্পাদনা)। লীলা মজুমদার রচনাবলী ২। এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি। কলেজ স্ট্রিট মার্কেট। কলিকাতা-৭। প্রথম প্রকাশ ১৩৬১।

১৩) মৈত্র সমীর (সম্পাদনা)। লীলা মজুমদার রচনাবলী ৩। এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি। কলেজ স্ট্রিট মার্কেট। কলিকাতা-৭। প্রথম প্রকাশ ১৩৬২।

১৪) রহমান লুৎফার মোহাম্মদ। সরলা। মোহাম্মদী বুক এজেন্সী। কলকাতা।প্রথম সংস্করণ। ১৩২৫।

সহায়ক গ্রন্থঃ-

১) ঘোষ তপোব্রত। রবীন্দ্র ছোটোগল্পের শিল্পরূপ। দে জ কলকাতা। আগষ্ট ২০০৩

২) ঠাকুর অবনীন্দ্রনাথ। ক্ষীরের পুতুল। পাঠক পাবলিশার্স, কলিকাতা। ২০১৪।

৩) হালদার নারায়ণ। ভাষা ও সংস্কৃত। ভাষা ও সংস্কৃতি গবেষণা পরিষদ, মদনপুর, নদীয়া, তৃতীয়বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা। শ্রাবন ১৪২৫।

বৈদ্যুতিন সহায়ক তথ্য:-

1)www.prathamala.com
2) Strokesuppart.in
3) www.creativebenglasalution
4) probondhoo.com
5) www.highersecondaryxyz
6) www.credh.gov.bd
7) notunsokal.com
8) www.unfoldbangla.com
9) bn.w.wikipedia.org
10) www.millioncontent.com
11) learningportal.iiep.unesco.org
12) bn.vikaspedia.in
13) nitr.itewb.gov.in
14) www.panchurcollege.ac.in

তথ্যসূত্রঃ-

১) ঘোষ বিজিত (সম্পাদনা)। নকশাল আন্দোলনের গল্প। পুনশ্চ। কলকাতা। জানুয়ারি ১৯৯৯। দ্বিতীয় সংস্করণ জানুয়ারি ২০০৮। পৃঃ ২৩৪-২৪১

২) ঠাকুর শ্রী রবীন্দ্রনাথ (গল্পগুচ্ছ অখণ্ড সংস্করণ)। বিশ্বভারতী, ৬/৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা। শ্রাবন, ১৩৩৩। পৃঃ ২০৪-২১১।

৩) প্রামানিক মলয় (সম্পাদনা)। রামায়ন কৃত্তিবাস বিরচিত। গ্রন্থবিকাশ, কলিকাতা-৭, জানুয়ারী ২০১১। পৃঃ ৩৭

৪) মজুমদার ডঃ অমলেন্দু, ব্যানার্জী সুনীপা দেব। শিক্ষাবিজ্ঞানের ভূমিকা ক্যালকাটা বুক হাউস ১/১, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০০৭৩। মার্চ ২০১৯। পৃঃ ১৯০।

৫) হালদার নারায়ণ। ভাষা ও সংস্কৃতি। ভাষা ও সংস্কৃতি গবেষনা পরিষদ । তৃতীয় বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, শ্রাবন, ১৪২৫। পৃঃ ৯৯-১০৫।